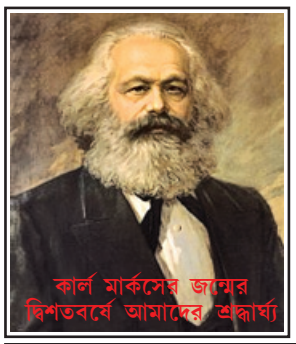

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

মে '১৮ ■ ৪৭তম বর্ষ ■ প্রথম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

রাজ্য সরকারের খামখেয়ালি আচরণ ও প্রতারণার বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ

দক্ষিণ দিনাজপুর

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশন এই দুটি বিষয় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের স্থায়ী যন্ত্রনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ বছরে দু'বার মহার্ঘভাতা ঘোষণা করার স্বীকৃত পদ্ধতি বাতিল হয়েছে। বৎসরান্তে একবার করে মহার্ঘভাতা দেওয়া হলেও, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় হারকে অনুসরণ করা হয় না। যখন যেমন খুশি ঘোষণা করা হয়। ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় হার সাপেক্ষে প্রাপ্ত মহার্ঘভাতার বকেয়ার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে সম্প্রতি ৪৯ শতাংশে পৌঁছেছিল। যা একটি সর্বভারতীয় রেকর্ড। কারণ অন্য কোন রাজ্যে এত বিপুল পরিমাণ মহার্ঘ্যভাতা বকেয়াতো নেই-ই, এমনকি তাঁরা ভাবতেও পারেন না যে এভাবে মহার্ঘভাতা বকেয়া রাখা যেতে পারে। এই রাজ্যেও বামফ্রন্টের আমলে সরকারী কর্মচারীদের এই ধরণের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা কখনই হয়নি।

মহার্ঘভাতার মতই মরুভূমির মরীচিকায় পরিণত হচ্ছে বেতন কমিশন'ও। তিন বছর ধরে খালি মেয়াদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এতদিন ধরে বেতন কমিশন কি করছে বা আদৌ কিছু করছে কিনা কেউ জানে না। মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী দুজনেই এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

এই পরিস্থিতিতে যখন কর্মচারীদের ক্ষোভের পারদ চড়ছে এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচীতে শামিল হচ্ছেন, তখন কর্মচারীদের বোকা বানানোর জন্য ছেলে ভোলানো মোয়া হাতে নিয়ে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী, সঙ্গী অর্থমন্ত্রী ও

▶ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বর্ধমান

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সুবিশাল বিক্ষোভ মিছিল

৫ জুন ২০১৮ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির পক্ষ থেকে বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘ রিলিফ, বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও অনতিবিলম্বে তা কার্যকর করা, ক্যাশলেশ চিকিৎসার ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার, চিকিৎসা ব্যয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান এবং রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা ও সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে বিকাল ৩টায় পেনশনার বন্ধুদের সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখছেন বামপরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী

মিছিলে অনাদায়ী দাবীর যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট কলকাতা ও নিকটবর্তী জেলার কয়েক হাজার পেনশনার বন্ধু যোগ দেন।

সমাবেশে প্রাথমিক বক্তব্যে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুশীল ব্রহ্ম দীর্ঘ বঞ্চনার বিরুদ্ধে বার বার দাবি উত্থাপনের পরেও তার অস্বীকৃতির চিত্র তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। তিনি বলেন কর্মচারীদের মতোই পেনশনার্স, পারিবারিক পেনশনারদের ন্যায্য দাবিগুলি একই ভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে। এই সময়কালে কর্মচারী ও পেনশনাররা বিভিন্ন সময়ে দাবিপত্র পেশ সহ নবান্ন অভিযান ও পে-কমিশনের নিকট গণ ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হয়েছেন। অনতিবিলম্বে দাবিগুলির সুমীমাংসা না হলে আগামী দিনে আরও কঠিন সংগ্রামের পথেই দাবি আদায়ের পথ খুঁজতে হবে।

রাজ্যের বিধানসভার বামপরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী রাজ্য সরকারের শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীন মানুষদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের দায়িত্বহীন ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি পেনশনারদের নায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং আগামী দিনে কর্মচারী ও পেনশনারদের ন্যায্য দাবি আদায়ের যে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। □

মুখ্যমন্ত্রী সমীপে খোলা চিঠি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রদ্ধেয় মহাশয়া,

আপনি এই রাজ্যের প্রশাসনিক কর্ণধার। পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক দলের একমেবদ্বিতীয়ম নেত্রীও বটে। স্বভাবতই আপনার তুমুল ব্যস্ততার কথা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু আমরাও অনন্যোপায়। কয়েকটি কথা আমাদের বলতেই হবে। বিশেষত, গত ১৯ জুন নবান্নে সাংবাদিকদের সামনে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য 'মহার্ঘভাতা' ঘোষণা করতে গিয়ে আপনি এবং আপনার সহকর্মী মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে কথাগুলি বলেছেন, তা এতটাই বিস্ময়কর (আপনাদের পদমর্যাদার কথা ভেবে 'হাস্যকর' বলা থেকে বিরত থাকলাম), যে তারপর আর চুপ করে থাকা যায় না। আপনিও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আপনার একান্ত বশংবদ সরকারী কর্মচারী সংগঠনটিও এবার আর খুব জোরে জোরে হাততালি দিতে পারেনি। মিঁউ মিঁউ করে (আপনি যে অর্থে এক সময় বলেছিলেন, সে অর্থে নয়। 'মৃদু স্বরে'—এই অর্থে) দু একটি কথা তাঁরা আপনাকে খুশি করার জন্য বলেছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল না। আপনি আনুষঙ্গিক কথা সহ যে ঘোষণা করতে চলেছেন, তা যে কর্মচারীদের বিন্দুমাত্র খুশি করতে পারবে না, তা আপনি নিজেও জানতেন। তাই এবার আর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম বা নজরুল মঞ্চে কর্মচারী সমাবেশের নামে দলীয় কর্মীদের সভা ডেকে এই ঘোষণাগুলি করার ঝুঁকি নেননি। আপনার মনেও সংশয় ছিল যে এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

যা আমাদের সব থেকে বেশী হতবাক করেছে, এবং যা অভাবনীয় বা অচিন্তনীয় বিষয় তা হল, একজন প্রশাসনিক প্রধান এবং তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ সহকর্মী কথার মার-প্যাঁচে প্রকৃত সত্যকে গোপন করছেন! প্রতিশ্রুতি দিয়ে পূরণ না করার ভুরি ভুরি উদাহরণ আমাদের দেশে রয়েছে। আপনার জমানাতেও এমন উদাহরণের শেষ নেই। কিন্তু একেবারে চূড়ান্ত ঘোষণার সময়েও কথার 'জাগলারি' করে সাময়িকভাবে হলেও ভুল বোঝানোর চেষ্টা, এই ব্যাপারে সম্ভবত আপনিই অদ্বিতীয়। কেন একথা আমরা বলছি? ঘোষণা করার সময় আপনি বললেন, ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা ও ১০ শতাংশ ইন্টেরিম রিলিফ দেওয়া হবে। আপনার ঘোষণা শেষ হতে না হতেই, অর্থমন্ত্রী এক কিম্ভূত যুক্তি হাজির করলেন। তা হল, ১০ শতাংশ ইন্টেরিম রিলিফ ৭ শতাংশ মহার্ঘভাতার সমতুল, তাই ধরে নিতে হবে মোট ১৮+ ৭ =২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়া হল। অর্থাৎ বর্তমানে প্রাপ্ত ১০০ শতাংশ মহার্ঘভাতা বেড়ে দাঁড়াল ১২৫ শতাংশ ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থমন্ত্রীর এই অদ্ভূত যুক্তি গণ্ডাখানেক 'হাজমোলা' খেয়েও হজম করা কঠিন। তাই এব্যাপারেও আমাদের দু-একটি কথা বলার আছে। কিন্তু তার আগে বলি, আপনি যা বললেন এবং কিছুক্ষণ বাদে প্রকাশিত 'প্রেস রিলিজ'-এ যা উল্লিখিত হল, সেই দুটো কি এক? আপনার ঘোষণা শুনে মনে হয়েছিল ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতার সাথে আরও একদফা ১০ শতাংশ ইন্টেরিম রিলিফ কর্মচারীরা পাবেন। এই মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বেতন কমিশনের সময় একাধিকবার 'ইন্টেরিম রিলিফ' দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 'প্রেস রিলিজ' হাতে পাওয়ার পর বোঝা গেল, ২০১৬-র জুন মাসে যে ইন্টেরিম রিলিফ ঘোষণা করা হয়েছিল, যা কর্মচারীরা গত প্রায় দু'বছর ধরে বেতনের সাথে পাচ্ছেন, আগামী জানুয়ারি (২০১৯) থেকে তা ৭ শতাংশ মহার্ঘভাতায় কনভার্টেড হবে। অর্থাৎ প্রাপ্তি বলতে মাত্র ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতাই। আরও মজা হচ্ছে আই আর কে মহার্ঘভাতা বা ডি এ-তে কনভার্ট করলে অঙ্কের হিসেবে বহু কর্মচারীর প্রাপ্য সামান্য হলেও কমে যাচ্ছে। এক কথায় গত প্রায় ২ বছর ধরে প্রাপ্য ভাতাকে নাম পরিবর্তন করে কর্মচারী ঠকানোর ব্যবস্থা করা হল। দ্বিতীয়ত প্রতিটি ভাতার পৃথক পৃথক প্রেক্ষিত থাকে, উদ্দেশ্য থাকে। এক ধরনের ভাতাকে আর এক ধরনের ভাতায় রূপান্তরিত করা অযৌক্তিকতো বটেই, অন্যায্যও। মহার্ঘভাতা মূল্যবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। বেতন কমিশনের সাথে মহার্ঘভাতা প্রাপ্তির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু 'ইন্টেরিম রিলিফ' সম্পূর্ণতই বেতন কমিশনের সাথে সম্পর্কিত। বেতন কমিশন কোন কারণে বিলম্বিত হলে 'ইন্টেরিম রিলিফ' দেওয়া হয়। এ রাজ্যের বেতন কমিশন অস্বাভাবিক বিলম্বিত হচ্ছে। অথচ 'ইন্টেরিম রিলিফ' যা দেওয়া হচ্ছিল, আগামী জানুয়ারি মাস থেকে তা আর পাওয়া যাবে না। এর মানে কি? তাহলে কি পে-কমিশন খুব দ্রুত কার্যকরী হবে? যদি তা-ই হয়, তাহলে নভেম্বর মাসে বেতন কমিশনের বর্ধিত মেয়াদ শেষ হবার পর, নিশ্চয়ই তাকে আর বৃদ্ধি করা হবে না। কিন্তু আপনার ভাষণে তেমন কিছুতো শুনলাম না। বরং নভেম্বর পেরিয়ে জানুয়ারি থেকে মহার্ঘভাতা ঘোষণা করলেন বর্তমান বেতনক্রমে ওপরেই। তার মানে নভেম্বরেও বেতন কমিশন হচ্ছে না। কবে হবে তারও কোন ইঙ্গিত আপনার ঘোষণায় নেই। বেতন কমিশনের প্রক্রিয়াকে আরও টেনে নিয়ে যাবর ইচ্ছেই যদি আপনার থাকে, তাহলে ইন্টেরিম রিলিফটা তুলে দিলেন কেন? এই দুটি বিষয় স্ব-বিরোধী নয়? বেতন কমিশনের প্রক্রিয়াভুক্ত করা হয়েছিল বলেই তো কর্মচারীদের 'রিলিফ' দেওয়া হচ্ছিল। তাহলে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার আগেই 'রিলিফ' বন্ধ করা হল কোন যুক্তিতে?

পাশাপাশি, আপনি 'কমিটমেন্ট ফুলফিল' করার যে দাবি করেছেন, তারও কোন অর্থ আমরা খুঁজে পাইনি। অবশ্য আমরা আদৌ জানিনা আপনার কি কমিটমেন্ট ছিল? কখন, কোথায়, কাদের সামনে আপনি সেই কমিটমেন্ট করেছিলেন, তাও আমাদের জানা নেই। কারণ বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও (প্রোটোকল মেনে) আপনি আমাদের সাথে দেখা করার সৌজন্যটুকও দেখাননি। আপনার প্রতিনিধি হিসেবে দু'বার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সাথে আলোচনায় বসেছিলেন। অনেকগুলি বিষয়ে তিনি 'কমিটমেন্ট' করেছিলেন, আপনার সাথে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের। কিন্তু একটি বিষয়েরও সুরাহা হয়নি। তাই, কিছু মনে করবেন না, কমিটমেন্ট কথাটাই আপনাদের মুখে বড্ড বেমানান। তাছাড়া আমরাতো জানি, কর্মচারীদের সমস্ত ন্যায্য দাবিকে পূরণ করাই সরকারের 'কমিটমেন্ট'। কিন্তু এমনকিছু

▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীগণের নাম

চেয়ারম্যান	ঃ	সুভাষ লাম্বা (হরিয়ানা),
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	এ শ্রীকুমার (কেরালা)
সহ-সাধারণ সম্পাদক	ঃ	বিজয় শংকর সিংহ (পশ্চিমবঙ্গ)
		এম আম্বারাসু (তামিলনাড়ু)

এছাড়াও সহ-সভাপতি এবং সম্পাদক পদে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়েছেন। পশ্চিমবাংলা থেকে বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সুতপা হাজরা কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

২৬-২৭ জুন ৫ দফা দাবিতে ব্যাজ পরিধান ও দপ্তরে দপ্তরে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ সভা

(১) বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে দিতে হবে। (২) ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত প্রকাশ ও চালু করতে হবে। (৩) হেলথ স্কিমের টাকা প্রদানে টাল-বাহানা বন্ধ কর। (৪) শূন্যপদ পূরণ ও চুক্তিপ্রথায় কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। (৫) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, গণতন্ত্র, ধর্মঘটের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

সম্পাদকীয়

ধাপ্পাবাজির চার বছর

এই বছরের মে মাসে শ্রীনরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার চার বছর পূর্ণ করল। অবশ্য এই সরকারকে আদৌ এনডিএ অর্থাৎ জোট সরকার বলা যায় কিনা, তাও একটা বড় প্রশ্ন। কারণ ইতোমধ্যেই এনডিএ-র মেজো-ছোট শরিকরা প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তাদের সকলেরই একই অভিযোগ। অভিযোগটা হল—বড় শরিক বিজেপি জোটধর্ম মানছে না। অন্যান্য শরিকদের পাত্তা না দিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মতো সরকার চালাচ্ছে। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা তো এতটাই ক্ষুব্ধ যে তারা এখন থেকেই ঘোষণা করে দিয়েছে, আগামী লোকসভা নির্বাচনে (২০১৯) তারা একাই লড়বে। বিহারের নীতীশ কুমার অতখানি সুর না চড়ালেও, অসন্তোষ গোপন রাখেননি। তিনি বলেছেন, আগামী নির্বাচনে সারা দেশে বিজেপি বড় শরিক হলেও, বিহারে তাঁকেই বড় শরিকের মর্যাদা দিতে হবে। রাজনৈতিক শক্তির নিরিখে এঁদের তুলনায় অনেকটা দুর্বল হলেও, রামবিলাস পাশোয়ানের দলও হাবে-ভাবে বোঝাতে শুরু করেছে যে, তারাও বিজেপির সরকার চালানোর পদ্ধতিতে অখুশি। অবশ্য এরা যে কোনো নীতিগত কারণে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগছে তা নয়। এন ডি এ জোটের মধ্যে থেকে জনস্বার্থবাহী কোন বিকল্প কর্মসূচী উত্থাপন করেও গ্রহণ করাতে না পেরে যে তাঁরা হতাশা প্রকাশ করছেন তাও নয়। মূলত আঞ্চলিক রাজনীতির প্রতিনিধিত্বকারী এই দলগুলি নিজ নিজ রাজ্যে পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে টের পেয়েই ছটফট করতে শুরু করেছে। যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার দায় তাদের ঘাড়ে না চাপে। এদের এই কাণ্ডজে বিদ্রোহ কত দূর পৌঁছোয় তা ভবিষ্যৎই বলবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বোদ্ধা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, বিজেপির সরকার চালানোর পদ্ধতির সাথে যে তার আদর্শগত অবস্থানের যোগসূত্র রয়েছে, সেই বিষয়টিকে আড়াল করার জন্য বলতে ও লিখতে শুরু করেছেন—আসলে এই ত্রুটিটা (শরিকদের পাত্তা না দেওয়া) ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীর ত্রুটি। তাঁর এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য পূর্বসুরী বাজপেয়ীজীর কাছ থেকে নাকি শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ রাজনীতির স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁকের জন্য এই ত্রুটি নয়। নিতান্তই ব্যক্তিগত ত্রুটি। মাস্টারমশাই (বাজপেয়ীজী) বকা দিলেই ছাত্র (মোদীজী) ভুল সংশোধন করে নিয়ে সব শরিকের সাথে কোলাকুলি করে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলবেন। অবশ্য মাস্টারমশাই খুবই অসুস্থ, শয্যাশায়ী। বকা দেবার ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে কিনা ঘোর সন্দেহ। কিন্তু ক্ষমতা থাকলেও তাঁর বকা-ঝকায় ছাত্র সংশোধিত হতো বলে মনে হয় না। কারণ, শোনা যায় ২০০২ সালে গুজরাটে যখন সাম্প্রদায়িক গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল, তখন এই ছাত্রটি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। আর মাস্টারমশাই ছিলেন দেশের কর্ণধার। তিনি ছাত্রটিকে 'রাজধর্ম' পালন করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বেয়ারা ছাত্রটি মাস্টারমশাইয়ের 'সুপরামর্শ' কানেও তোলেনি। নীতিবাগীশ(?) মাস্টারমশাইও ছাত্রটিকে শুধুমাত্র উপদেশ দিয়েই দায় সেরেছিলেন। বেয়ারা ছাত্র আর তার স্যাঙাৎরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ত নিয়ে হোলি খেললেও, তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। বরং তার পরেও দীর্ঘদিন ছাত্রটি বহাল তবিয়তে মুখ্যমন্ত্রিত্ব চালিয়ে গেছে। আসলে ব্যক্তির ভুল বলার মধ্যে গোটা বিষয়টিকে লঘু করে দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে।

বাজপেয়ীজীর আমলে এনডিএ জোটে বিজেপির একক গরিষ্ঠতা ছিল না। ফলে বাধ্য হয়ে চোখ পিট পিট করে, মৃদু হেসে মিঠে কথা অটলবিহারী বাজপেয়ীকে বলতেই হতো। কোনো এক শরিক গোঁসা করে সরে গেলেই, সরকারও ধূপ করে পড়ে যাওয়ার শঙ্কা ছিল। শুরুর কয়েকটা বছর মোদীজীর সেই শঙ্কা ছিল না। একক গরিষ্ঠতা ছিল তাঁর পকেটে। ফলে কাঁধে হাত দেওয়া বা মিঠে কথা বলা—কোনোটারই প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি। তাছাড়া মিডিয়ার দৌলতে এই সরকার তার ইনিংস শুরু করার আগে থেকেই 'মোদী সরকার'। প্রাক্ নির্বাচনী প্রচারে আমরা শুনেছি—'আগলি বার মোদী সরকার।' ফলে শুরু থেকেই এটা কখনো এনডিএ সরকার তো ছিলই না,এমনকি বিজেপি সরকারও ছিল না। ছিল মোদী সরকার। মোদীজীর ছাপান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি (পেশাদার কুস্তিগীরকেও লজ্জা দেবে), তাঁর নিয়মিত যোগ ব্যায়ামের অভ্যাস, ছোটবেলায় চা-ওয়ালার সাব-অলটার্ন জীবন, ভোর সাড়ে পাঁচটায় আকাশবাণীতে বাংলা না বুঝেও রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা (যদিও আকাশবাণী চালু হয় ভোর ছ'টায়!) প্রভৃতি প্রচারে এসেছে। আর প্রচারে এসেছে তাঁর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অক্লান্ত ছুটে বেড়ানো। মোদীপ্রেমে গদগদ কর্পোরেট মিডিয়া আমাদের জানিয়েছে, বিশ্বের দরবারে দেশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্যই নাকি তিনি পায়ের তলায় সর্ষে লাগিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তাঁর ভ্রমণ পিপাসা এতটাই সাড়া ফেলেছে যে সোশ্যাল মিডিয়াও সরগরম। যেমন সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে দেখা যাচ্ছে, মোদীজীকে দেখিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি কিম জং উন প্রশ্ন করেছেন, 'ইনি কে' (আসলে উত্তর কোরিয়ায় এখনও মোদীজীর পদধূলি পড়েনি)? উত্তরে ট্রাম্প সাহেব বলেছেন, 'ইনি কলম্বাসের মতো একজন অতি বিখ্যাত পরিব্রাজক এবং ভারতের 'পার্ট-টাইম' প্রধানমন্ত্রী।' কার্যত তা-ই। গত চার বছরের সময়কালকে দিন বা ঘণ্টার হিসেবে ভাগ করলে হয়তো দেখা যাবে, তিনি দেশের থেকে বিদেশেই বেশি সময় কাটিয়েছেন। তবে অহরহ বিদেশ ভ্রমণ করলেও, একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, এই ভ্রমণেরও একটা প্যাটার্ন রয়েছে। তিনি সব থেকে বেশি গেছেন সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দারুণ আনন্দে গদগদ দেখিয়েছে জায়নবাদী ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতান-হু-র সাথে হাত ধরাধরি করে সমুদ্র সৈকতে বেড়ানোর সময় আর একাধিকবার একদা হিন্দুরাষ্ট্র নেপালে গিয়ে মন্দিরে পুজো দেবার সময়। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই বিশেষ বিশেষ দেশগুলির প্রতি তাঁর ঝোঁকের কারণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা আধুনিক সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য নয়। তাঁর মতাদর্শগত অবস্থানই এই ঝোঁকের কারণ।

যাই হোক এহেন প্রচার সর্বস্ব মোদীজী যে ধরাকে সরা জ্ঞান করবেন তা বলাই বাহুল্য। তিনি শুধু যে শরিকদের পাত্তা দেন নি তা নয়, এমনকি তাঁর নিজের দলের মধ্যেই অনেককেই সামনের সারি থেকে পিছনের সারিতে ঠেলে দিয়েছেন। আদবানি, যোশীর মতো নেতারাও ব্রাত্য হয়ে পড়েছিলেন। শরিকদেরই মতোই দলের মধ্যেও কেউ প্রথম কয়েক বছর ট্যাঁ-ফোঁ করার সাহস দেখায় নি। তারা ভেবেছে, যাকগে মোদীজীকে সামনে রেখে ক্ষমতার চুঁইয়ে পড়া (এও এক ট্রিকল্ ডাউন থিওরি) স্বাদ তো পাওয়া যাচ্ছে। তাই-বা কম কী? তারা ভেবেছে প্রচারের দৌলতে মোদীজীর 'লার্জার ফ্যান লাইফ' ইমেজে আর সবকিছুই বোধহয় চাপা পড়ে যাবে। এ এক ধরনের 'অবজেকটিভ ইল্যুশন'। মার্কস যাকে বলেছেন 'ভ্রান্ত চেতনা'। কিন্তু 'লজিক'-এর এক সাধারণ সূত্রকে তারা ভুলে গেছিল। সূত্রটি হল, সব মানুষকে কিছুদিনের জন্য বোকা বানানো যায়, কিছু মানুষকে সবসময়ের জন্য বোকা বানানো যায়, কিন্তু সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো যায় না। কারণ প্রচারের তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা যতই বেশি হোক না কেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার কাছে তাকে একসময় হার মানতেই হয়। অতীতেও ইন্দিরা গান্ধীর এমনই 'লার্জার ফ্যান লাইফ' ইমেজ তৈরি করা হয়েছিল। 'এশিয়ার মুক্ত সূর্য', 'ইন্দিরা ইস ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ইস ইন্দিরা' ইত্যাদি প্রচারে মানুষকে ভাসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও 'গরিবী হটাও' ইত্যাদি জনমোহিনী স্লোগানে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। একই পরিণতি ধীরে ধীরে ঘটছে নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রেও। 'ঘর ঘর মোদী' স্লোগান আর 'আচ্ছে দিন আনেওয়ালে হ্যায়' প্রচার করে সব মানুষকে বোকা বানানোর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হতে চলেছে। তবে ইন্দিরা জমানার সাথে মোদী জমানার বিভিন্ন দিক থেকে অনেকগুলি পার্থক্য রয়েছে। যেমন ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাঙ্ক ও কয়লাখনি জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করা, বিদেশ নীতির প্রশ্নে 'জোট নিরপেক্ষ' অবস্থানকে বজায় রাখা প্রভৃতি তাঁকে জনপ্রিয়তা অর্জনে সাহায্য করেছিল। অর্থাৎ তাঁর জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র প্রচারের সাহায্যে নির্মিত ফাঁপা জনপ্রিয়তা ছিল না। কিছু উপাদান ছিল যর ওপর রঙ চড়িয়ে আরও বড় করে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর তথাকথিত জনপ্রিয়তা সবটাই প্রচারসর্বস্ব। কারণ বিগত চার বছরে এমন কোনো কাজই তিনি বা তাঁর সরকার করেনি, যাঁকে সামান্যতম প্রগতিশীল বা জনস্বার্থবাহী বলা যেতে পারে। বরং তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ জনস্বার্থকে ধ্বংস করেছে। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর জনস্বার্থ বিরোধী নীতি যখন জনমানসে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, তখন সেই ক্ষোভকে প্রতিহত করার জন্য শুধুমাত্র প্রচার আর এক সময়ের কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপে যখন আর কাজ হচ্ছিল না, তখন তিনি চূড়ান্ত আঘাতে গণতন্ত্রের কাঠামোটাকেই ধ্বংস করে টিঁকে থাকতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর হাতে আর কোনো অস্ত্র ছিল না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দলের হাতে একটি মারাত্মক অস্ত্র রয়েছে। অস্ত্রটি হল সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের অস্ত্র। ইন্দিরা গান্ধীর 'মেন্টর' ছিলেন শুধুমাত্র একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং গ্রামের জোৎদার-জমিদার গোষ্ঠী। নরেন্দ্র মোদীর মেন্টর হিসেবে এরা তো আছেনই, আরও আছে নব উত্থিত কর্পোরেট পুঁজি, আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের 'হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ'। ইন্দিরা গান্ধীকে টিঁকে থাকার জন্য চূড়ান্ত আঘাত করতে হয়েছিল, আর নরেন্দ্র মোদী টিঁকে থাকার জন্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের বিষ ধীরে ধীরে সমাজের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও দলিত সমাজের ওপর প্রায় প্রতিনিয়ত যে আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে, তা থেকেই বোঝা যয় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের বিষ সমাজের গভীরে প্রবেশ করছে। অবশ্য এই কাজটা নরেন্দ্র মোদীর আমলে শুরু হয়েছে তা নয়, শুরু হয়েছিল বাজপেয়িজীর আমলেই। তবে এখন সংখ্যার জোরে এর গতি অনেক বেশি।

ইন্দিরা গান্ধীর আমলে রাষ্ট্রের চরিত্র ছিল জনকল্যাণকামী। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্তরে বেশ কিছু সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের তরফে গড়িমসি বা অনীহা প্রদর্শিত হলে, তার বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই গড়ে উঠত। অর্থাৎ লড়াইয়ের অভিমুখ ছিল জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়। কিন্তু আজ উদারবাদী অর্থনীতির আমলে রাষ্ট্রীয় স্তরে সেই প্রতিশ্রুতি অনুপস্থিত। ফলে আজকের লড়াই সেই ন্যায্যতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লড়াই। যার চরিত্র অনেক বেশি রাজনৈতিক ও মৌলিক।

ইন্দিরা জমানায় অভ্যন্তরীণ নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য ভিত্তিক, ক্ষেত্র ভিত্তিক, লড়াই ছিল। কিন্তু তা সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ চেহারা গ্রহণ করে যখন গণতন্ত্র আক্রান্ত হয়। আর এই ঐক্য গড়ে তুলেছিল মূলত অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দলগুলি (বামপন্থীসহ) এবং কংগ্রেস থেকে বেড়িয়ে আসা একটা অংশ। এক কথায়, ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্রের (জরুরি অবস্থা) বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভকে সংহত করছিল উপর থেকে রাজনৈতিক স্তরে গড়ে তোলা ঐক্য। কিন্তু মোদী জমানায় নয়া উদারবাদী অর্থনীতির আক্রমণ, সাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঐক্যটা গড়ে উঠছে মূলত নীচ থেকে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী গণসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা মঞ্চ প্রভৃতি সমস্ত ধরনের কুফলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তাগিদে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এই ঐক্যের চাপটা পড়ছে রাজনৈতিক স্তরে। যা বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে কাছাকাছি আসতে বাধ্য করছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী মনে করছিলেন, তিনি দেশটাকে বোধহয় বিরোধীশূন্য করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, বিষয়টা অত সহজ তো নয়ই, অসম্ভবও। ইন্দিরা গান্ধীর মতোই নরেন্দ্র মোদীও জনশক্তিকে উপেক্ষা করছিলেন। এই উপেক্ষার ফল হাতে-নাতে পেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। একাত্তরের এশিয়ার মুক্তিসূর্য অস্তগামী হয়েছিল সাতাত্তরেই। নরেন্দ্র মোদীও ধাক্কাটা অনুভব করতে শুরু করেছেন। তাই ছোট-মেজো শরিকদের সাথে কোলাকুলি শুরু করতে হয়েছে। এতদিন পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গীমাটা উধাও।

তবে এর মানে এটা নয় যে তিনি বা তাঁর দল রণে ভঙ্গ দিচ্ছে। বরং উল্টোটাই সত্যি। মোদীজী এন্ড কোম্পানী তুনীরের সমস্ত অস্ত্রগলিকে আরও ধারালো করে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। ফলে নীচ থেকে যে ঐক্যটা গড়ে উঠছে তাকে আরও জমাট বাঁধানোর কাজটা জরুরি এবং তা সম্ভব যদি একদিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইস্যুগুলিকে নিয়ে এবং অপরদিকে সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলিকে (গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রভৃতি) রক্ষা করার লড়াইটা চালিয়ে যাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে বামপন্থীদের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দিরা গান্ধীর আমলেও বামপন্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সে সময় কাজটা বামপন্থীদের পক্ষে ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ বামপন্থীদের ওপর রাজনৈতিক আক্রমণ থাকলেও 'বামপন্থা'-র বিরুদ্ধে মতাদর্শগত দিক থেকে আজ যে আক্রমণ নামানো হচ্ছে, তা সে সময় ছিল না। আজকের মতো সে সময় বামপন্থাকে অপ্রাসঙ্গিক তো বলা হতোই না, বরং দক্ষিণ পন্থীরাও জনসমর্থন আদায়ের জন্য বামপন্থার ভেক ধরত।

দ্বিতীয়ত জনগণ যত বেশি সমাজ সচেতন হন, তত বেশি তাঁরা বামপন্থার দিকে ঝোঁকেন। কিন্তু আজ বিশ্বায়নের যুগে মানুষকে সমাজ বিমুখ করে তোলা হচ্ছে। ফলে বামপন্থার দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ কিছুটা হলেও দুর্বল। পরিস্থিতির এই পরিবর্তন ঘটলেও বামপন্থীদের ইতিহাস নির্দিষ্ট ভূমিকার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধি তো তারাই। তাই কাজটা অনেকটা কঠিন হলেও, হতোদ্যম না হয়ে ধৈর্য সহকারে গণঐক্য নির্মাণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। গণঐক্যকে সতেজ ও সজীব রাখতে রক্ত সঞ্চালনের মতোই ভূমিকা হবে বামপন্থীদের। বামপন্থীদের বাদ দিয়ে গড়ে ওঠা রক্তশূন্য রাজনৈতিক ঐক্য কখনও শাসকশ্রেণীর নিদ্রা হরণ করে না। কারণ সেই ঐক্যের পরতে পরতে জনগণের লড়াই-আন্দোলনের উত্তাপ থাকে না, থাকে না মৌলিক পরিবর্তনের আকাঙ্খা, থাকে শুধু ক্ষমতার মোহ। □

২২ জুন, ২০১৮

রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষামন্ত্রী। বলা ভাল, কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটে দিলেন। অবশ্য তাঁরাও জানতেন এই চাতুরিতে কর্মচারীরা খুশিতো হবেই না বরং আরও ক্ষুব্ধ হবে। তাই এবার আর কর্মচারী সমাবেশের নামে দলীয় কর্মীদের ডেকে হাততালি সহযোগে ঘোষণা করেন নি। নবান্ন থেকেই কাজ সেরেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় কমিটমেন্ট পূরণ করেছেন।

দুটি কারণে এবারের ঘোষণা সকলকে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। প্রথমত সাত মাস আগে ঘোষণা করে (১৮ শতাংশ), সাত মাস পরে দেওয়া ভূ-ভারতে কেউ কখনো শোনেননি।

এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নিজেই নিজের রেকর্ড ভেঙেছে। দ্বিতীয়ত, ইন্টেরিম রিলিফকে মহার্ঘভাতায় কনভার্ট করার কিম্ভূত যুক্তিও কেউ কখনও শোনে নি। কারণ মহার্ঘভাতা ও ইন্টেরিম রিলিফ এই দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। অবশ্য যে সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অতীতে 'ডিএ চান না বেতন চান'-এর মতন অদ্ভুত মন্তব্য করতে পারেন বা কর্মচারীদের প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করতে পারেন (ঘেউ ঘেউ, মিউ মিউ করা), সেই সরকারের কাছ থেকে এমন অপযুক্ত অপ্রত্যাসিত নয়। এই কিম্ভূত ঘোষণার মধ্য দিয়ে আরও একটি বিষয় কর্মচারীদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে, তা হল ষষ্ঠ বেতন কমিশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য হিম ঘরে চলে গেল। হয়তবা পঞ্চত্বর প্রাপ্তিই ঘটল। বেতন কমিশনের ভবিষ্যত সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর ও অর্থমন্ত্রীর নীরবতা এই সন্দেহকেই দৃঢ় করছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে গত ২০ জুন রাজ্যের সর্বত্র, কলকাতা সহ প্রতিটি জেলায় টিফিন বিরতিতে আয়োজিত বিক্ষোভ সভায় কর্মচারীরা বেরিয়ে এসে ক্ষোভ উগরে দেন। প্রতিটি বিক্ষোভ সভাতেই বক্তাদের বক্তব্যে ও কর্মচারীদের স্লোগানে ক্ষোভের উদগীরণ ঘটেছে। আগামী ২৬-২৭ জুনের পূর্ণ নির্ধারিত বিক্ষোভ কর্মসূচীতে যা আরও বড় আকার ধারণ করবে। □

বীরভূম জেলায় দানমেলা

গত ১০ জুন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে সংগঠনের জেলা দপ্তর পুনর্নির্মাণের জন্য এক দানমেলার আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করে নূরে আলম, অঞ্জনা বীরবংশী ও সুদীপ্ত গুহকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক উজ্জ্বল মুখার্জী। এই কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ সিংহরায়। সাধারণ সম্পাদকও এই সভায় বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলার প্রবীণ নেতা আলোক চট্টোপাধ্যায়। এই কর্মসূচীতে সর্বমোট ১,৫৩,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। পরবর্তী পর্বে সর্বমোট ৩,১০,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে। জেলার যুগ্ম সম্পাদক সৌমেন চ্যাটার্জী দানমেলায় উপস্থিত থেকে যে সমস্ত কর্মচারী অর্থ প্রদান করেছিলেন তাদের নাম ঘোষণা করেন। কর্মসূচীতে দুই শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন মুখপত্র শরিকের ৫০ বছর পূর্তির কর্মসূচী হিসাবে ১৯ জুন '১৮ রবিবার সারাদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক মিলন মেলার আয়োজন করে টাকী গভর্নমেন্ট স্পন্সরড মাল্টিপারপাস স্কুল ফর বয়েজ স্কুলে। সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন, বসে আঁকো, আবৃত্তি, সঙ্গীত, বিতর্ক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেন সমিতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অঙ্গীভূত ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের সদস্য / সদস্যা এবং পরিবার-পরিজন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন নিখিলরঞ্জন পাত্র, উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অশোক পাত্র, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। প্রতিযোগিতার শেষে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচীটি সমাপ্ত হয়। প্রায় ২০০ প্রতিযোগী, পরিবার পরিজন ও কর্মী-নেতৃত্বের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। □

পঞ্চায়েত নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়

রাজ্যের নবম পঞ্চায়েত নির্বাচন অবশেষে 'সম্পন্ন' হলো। অনেক টালবাহানার পর হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট-এর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪মে একই দিনে রাজ্যের সর্বত্র ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বে ঘোষিত নির্ঘন্ট অনুযায়ী তিনটি পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, বিশেষত মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর্বে ব্যাপক অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের রায় ও সুপ্রীম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পরিণতিতে ১৪ মে একদিনে সারা রাজ্যে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। পূর্বের নির্ঘন্ট অনুযায়ী ১ মে (১২টি জেলায়), ৩ মে (দুটি জেলায়), ৫ মে (৬টি জেলায়) নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়েছিল, পরে ১ দিনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নজিরবিহীন সন্ত্রাস, পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের দলদাসের ভূমিকা ও সর্বোপরি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অযোগ্যতা, অপদার্থতার এক ঘৃণ্য নজির সৃষ্টি হয়েছে।

নির্বাচনী 'ফলাফল' অনুযায়ী রাজ্যে পঞ্চায়েতের মোট আসনের ৩৪ শতাংশ বা বিশ হাজারের বেশি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা'য় জয়ী হয়েছে। নির্বাচনের পূর্বেই তিনটি জেলা পরিষদ (মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া) তৃণমূল কংগ্রেস 'দখল' করে নেয়। নির্বাচনী প্রহসনের পর উভয় বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও একাধিক জেলা পরিষদ 'বিরোধী শূন্য' হয়ে যায়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে তৃণমূল কংগ্রেস জেলা পরিষদের ৯৫ শতাংশ আসন, পঞ্চায়েত সমিতির প্রায় ৮৩ শতাংশ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৬৮ শতাংশ আসন দখল করেছে। চূড়ান্তভাবে সব তথ্য প্রকাশিত হলে এই তথ্যের সামান্য কিছু হেরফের হতে পারে। এর পাশাপাশি বিজেপি 'দ্বিতীয়' স্থানে রয়েছে। এই দল জেলা পরিষদের মাত্র চার শতাংশ আসন, পঞ্চায়েত সমিতির দশ শতাংশ ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাত্র ১৮ শতাংশ আসনে জয়ী হয়েছে। বামফ্রন্ট জয়লাভ করেছে জেলা পরিষদের ০.২ শতাংশ আসনে, পঞ্চায়েত সমিতির ১.৯ শতাংশ আসনে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫.৩ শতাংশ আসনে। কংগ্রেস জেলা পরিষদের ১ শতাংশ আসনে, পঞ্চায়েত সমিতি ২.৬ শতাংশ আসনে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস ৩.৩ শতাংশ আসনে জয়ী হয়েছে। অবশিষ্ট আসনে জয়ী হয়েছে নির্দল প্রার্থীরা, যাদের অধিকাংশই বিক্ষুব্ধ তৃণমূল। এই নির্বাচনী ফলাফল বিশেষভাবে যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তা গভীরভাবে সর্বস্তরে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

এক

১৪ মে অনুষ্ঠিত নবম পঞ্চায়েত নির্বাচন ত্রিস্তরের মোট ৫৮, ৬৯২টি আসনের মধ্যে ৩৮ হাজার ৬১৬টি আসনে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ৩৪ শতাংশ আসন বা ২০ হাজার ৭৬টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। প্রথমত উল্লেখযোগ্য যে অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচন (২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত) তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই গ্রহণ করা হয়েছিল। এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ১৭টি জেলা পরিষদের ১৩টিতে, ৩২৯ টি পঞ্চায়েত সমিতির ২১৪টিতে ও ৩২১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৮৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী হয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া আসন সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে মাত্র ৬২৭৪টি। অবশ্য পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুরের জেলা পরিষদে বিরোধী সদস্যদের লোভ দেখিয়ে বা চাপ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দখল করে নেয়। বেশ কিছু পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের দখলও এইভাবে নেওয়া হয়।

এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সমগ্র পর্বটিই ছিল হিংসাত্মক ও রক্তাক্ত। মনোনয়ন পত্র জমা দেবার শুরু থেকেই দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সমাজ বিরোধীদের তাণ্ডব। প্রশাসন এবং পুলিশের ওপরওয়ালাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত অযোগ্যতা ও অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে এই ভৈরব বাহিনীই বিরোধী দলের বিশেষত বামপন্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা সৃষ্টি করে। শুধুমাত্র প্রার্থীদের হুমকি দেওয়াই নয়, তাদের পরিবার পরিজনদের এমনকি ছোট ছোট শিশুদের পর্যন্ত সন্ত্রাসের শিকার হতে হয়। কোথাও কোথাও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় বাধা সৃষ্টির জন্য ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

ভয়ঙ্কর আক্রমণ এমনকী মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করেও হাজার হাজার মানুষ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের সন্ত্রাস শুরু হয় মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর্বে। এই পর্বে সন্ত্রাসের চরিত্র ছিল আরো ভয়াবহ ও হিংসাত্মক। প্রার্থীর স্ত্রীর কাছে সাদা থান কাপড় পাঠিয়ে তার বৈধব্য ঘটতে পারে এই হুমকিও দেওয়া হয়, প্রার্থী স্বামীর বা ছোট ছোট সন্তানের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়েছে-- এমন নজিরও আছে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া ও তা প্রত্যাহার পর্বে কম করে ৩৪ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এইভাবে রাজ্যের ২০ হাজারের বেশি প্রতিনিধি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বি তায় জয়ী হয়েছে। এদের নির্বাচিত করবার দায়িত্ব ছিল ২ কোটির বেশি ভোটারের। তাদের সে সুযোগ না দিয়ে তাদের জন প্রতিনিধি হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ ভোট গ্রহণের দিন রাজ্যের সর্বত্র সৃষ্টি করা হলো ব্যাপক সন্ত্রাস। ভোটপত্র লুঠ, ছাপ্পা ভোট, বিশেষ করে বিরোধী বামপন্থী দলের এজেন্টদের ভোট কেন্দ্র থেকে বলপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া, প্রভৃতি অবাধে চালানো হলো। সিল করা ভোট বাক্স খুলে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রেই গণনা শুরু হয় এবং শাসকদলের প্রার্থীকে জয়ী করতে বিরোধী প্রার্থীর ব্যালট পেপার বাতিল করে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও ব্যালট বাক্স পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে শাসকদলের বশম্বদ রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে পর্যন্ত ৫৭৩টি বুথে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করতে হয়। অবশ্য এই পুনর্নির্বাচনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই পর্বে কাকদ্বীপে সিপিআই(এম) করার অপরাধে (!) দেবু দাস ও ঊষা দাসকে বদ্ধ ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারে তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনী।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনার দিনও সন্ত্রাসের চরিত্র ছিল একই। অনেক জায়গায় বলপূর্বক বিরোধী এজেন্টদের বাইরে বের করে দিয়ে নির্বাচনী আধিকারিকদের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের সমাজবিরোধীরা নিজেরাই গণনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোথাও কোথাও সিভিক পুলিশ ও অনুগত পুলিশ বাহিনী দিয়ে গণনা করানো হয়। এবং যেসব ক্ষেত্রে বিরোধীদের জয়ের সম্ভাবনা ছিল, সেখানে বিরোধীদের অনুকূলে ভোটপত্রগুলিতে কালি ঢেলে ছাপ দিয়ে বাতিল ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এমনকি উত্তর ২৪ পরগণা জেলাসহ বেশ কিছু জেলায় জয়ী বিরোধী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা না করে পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

বশংবদ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, দলদাস প্রশাসন এবং অপদার্থ পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে জীবনকে বাজি রেখে গ্রামবাংলার লড়াকু মানুষ আত্মসমর্পণ না করে অকুতোভয় লড়াই চালিয়েছেন। গ্রামের মানুষের এই লড়াইকে অবশ্যই কুর্ণিশ জানাতে হবে।

নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চারটি পর্যায়ে (মনোনয়ন পত্র প্রদান, প্রত্যাহার পর্ব, ভোট গ্রহণ ও গণনা) যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, তা নজিরবিহীন শুধু নয়, গণতন্ত্রের ওপর এ এক নিষ্ঠুরতম আক্রমণের প্রতীক ছাড়া কিছু নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শাসকদলের গুন্ডাবাহিনীর সন্ত্রাসের শিকার যেমন বামপন্থীরা হয়েছে, তেমনই তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ যারা দলের প্রতীক না পেয়ে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তারা। এই আক্রমণের শিকার হয়েছে সমগ্র পর্বে প্রায় ৫০ জন মানুষ খুন হয়েছে।

নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ হলো, তা বিক্ষিপ্ত কোনো বিষয় নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য সরকারে আসীন হবার পর থেকেই রাজ্যব্যাপী জীবন জীবিকা, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর যে ধারাবাহিক আক্রমণ সংগঠিত করে চলেছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনাগুলি তারই সম্প্রসারিত রূপ। তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি হলো বিরোধীশূন্য ও প্রতিবাদহীন পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলা। বিগত বছরগুলিতে এই লক্ষ্য পূরণে রাজ্য সরকারের জন বিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেগুলিকে নির্মম দমন পীড়ন চালিয়ে স্তব্ধ করা হয়েছে। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ডাকা ধর্মঘটগুলিকে ব্যর্থ করতে রাজ্য সরকার ও শাসকদলের গুন্ডা বাহিনীর পক্ষ থেকে নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছে। জীবন জীবিকা এবং গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর যে ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে তার পথ ধরেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাস সৃষ্টির বিষয়টি এসেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার পর্বটির সূত্রপাত ঘটে গত বছরের মাঝামাঝি সময় নাগাদ। এই সময় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকের আড়ালে তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সভাগুলিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দলীয় প্রচারে পরিণত করেন। কারণ প্রতিটি সভাতে তিনি যে বক্তব্য রাখেন, তার মূল কথা হলো এই যে রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েতে একই দল ক্ষমতাসীন হলে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে। একথা বলার পরই তিনি বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত গঠনের আহ্বান জানান। দলীয় নেত্রীর এই আদেশকে সামনে রেখে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত গঠনের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রামের মানুষের প্রতি কোনো প্রেম নেই। এর প্রধান কারণ হলো দুটি। প্রথম কারণটি হলো আর্থিক দুর্নীতি প্রতি বছর রাজ্য বাজেটের বিপুল অংশের অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে ব্যয়িত হয়ে থাকে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব কার্যত লুঠ করে। বিগত ৫ বছরে পঞ্চায়েত স্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সম্পত্তি ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হিসাব নিলে তা প্রমাণিত হয়। পঞ্চায়েতের বিপুল অর্থ লুঠ করে এরা বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছে। সুতরাং পঞ্চায়েতের অর্থ ভান্ডার যাতে বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণে না যায় তার জন্যই বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত গঠনের আহ্বান। দ্বিতীয়ত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা যায়। বিগত সময়কালে দেখা গেছে যে, তৃণমূল কংগ্রেস নিজের ভোটকে মজবুত করতে ব্যাক্তি উপভোক্তা তৈরি করছে। পঞ্চায়েতগুলি দখলে থাকলে এই কাজ করার অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। আগামী লোকসভা নির্বাচনে অধিক সংখ্যক আসন পেতে এই কাজটি জরুরি। যে কারণে বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত গঠনের আহ্বান।

নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনকেপ্রহসনে পরিণত করার ফলে এই নির্বাচনী ফলাফলকে কেন্দ্র করে রাজ্যবাসীদের মধ্যে একটা সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠছে যে রাজ্যের বিশটি জেলায় ৬২২টি জেলা পরিষদ আসনের (যে সব আসনে ভোট হয়েছে) মধ্যে বামফ্রন্ট (ফরোয়ার্ড ব্লক) মাত্র একটি আসন পেয়েছে। এটি কী করে সম্ভব? একইভাবে রাজ্যে ৩৪ শতাংশ বা ২০ হাজার ৭৬ জন তৃণমূলী প্রার্থী কিভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়? রাজ্যের বিরোধিরা কি এতটাই দূর্বল? এই ফলাফলের সাথে রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবতার আদৌ মিল নেই। দ্বিতীয় আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। রাজ্যে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এটি কী করে সম্ভব? দু'বছর আগে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনেও বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের থেকে বিজেপির অনেক পিছিয়ে ছিল। এর মধ্যে কী এমন পরিবর্তন হলো যে বিজেপি তৃতীয় স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হলো?

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপির মধ্যে কোনো গোপন বোঝাপড়া ছিল কি? নির্বাচন কর্মী এবং যারা ভোট কেন্দ্রে নিযুক্ত ছিল, তাদের অভিজ্ঞতা হলো এই যে, ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার সময় 'বদান্যতা' দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডা বাহিনী কিছু ব্যালট পেপারে বিজেপির পক্ষে ছাপ্পা দিয়েছে, যাতে বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে থাকে। আসলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীদের অপ্রসাঙ্গিক প্রমাণ করতে সুপরিকল্পিত ভাবেই যে এই কাজ করা হয়েছে —তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দুই

রাজ্যের নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্বে বর্ণিত ঘটনাবলী একমাত্র দিক নয়। এর অপর একটি দিকও আছে, যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে। বশংবদ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার, দলদাস প্রশাসন এবং অপদার্থ পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে জীবনকে বাজি রেখে গ্রামবাংলার লড়াকু মানুষ আত্মসমর্পণ না করে অকুতোভয় লড়াই চালিয়েছেন। গ্রামের মানুষের এই লড়াইকে অবশ্যই কুর্ণিশ জানাতে হবে। ভয়ঙ্কর হুমকি এমন খুনের হুমকিকে মোকাবিলা করে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া থেকে শুরু করে ভোট গণনা পর্যন্ত বীর সেনানিরা যে লড়াই করেছেন—এর মধ্যেই রয়েছে আগামী দিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত। এই পথে গ্রামের মহিলাদের ভূমিকাও বিশেষভাবে

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা মনে রাখা দরকার যে, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ফল হয় বিপজ্জনক। ১৯৭২ সালের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সেদিনও রাজ্যের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। মানুষ তার প্রতিশোধ নিয়েছিল ১৯৭৭ সালে। কংগ্রেস শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য। এইসব নারীরা গৃহস্থলীর সরঞ্জাম হাতা, খুন্তি, বঁটিকে গণতন্ত্র রক্ষায় সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছেন এবং জয়ী হয়েছেন তা অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। একই সাথে সর্বত্র না হলেও অনেক জায়গাতেই ভোটকর্মীরা এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। একজন ভোটকর্মী নিহত হয়েছেন, একাধিক ভোটকর্মী হামলার শিকার হয়েছেন।

গ্রাম বাংলার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জনগণের এই লড়াইকে সামনে রেখেই আগামী দিনেও রাজ্যব্যাপী জীবন জীবিকা ও গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। পঞ্চায়েতে দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে একদিকে যেমন পঞ্চায়েতের অভ্যন্তরে যতটা সুযোগ আছে তাকে ব্যবহার করতে হবে, তেমন অন্যদিকে মাঠে ময়দানে, ক্ষেতে খামারে লড়াইকেও গড়ে তুলতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা মনে রাখা দরকার যে, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ফল হয় বিপজ্জনক। ১৯৭২ সালের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। সেদিনও রাজ্যের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার। মানুষ তার প্রতিশোধ নিয়েছিল ১৯৭৭ সালে। কংগ্রেস শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়েছিল। সুতরাং মানুষ ক্ষোভে ফুসছেন। এদের এই ক্ষোভকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে প্রয়োজন শক্তিশালী সংগঠন, ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী ও গণআন্দোলন। এই লক্ষ্যে কর্মচারী সমাজকে আমাদের সংগঠিত করতে হবে এবং আগামী কর্মসূচীগুলিকে ব্যবহার করতে হবে। □

নয়া আঙ্গিকে শ্রমিক সংহতি দিবস

সুব্রত কুমার গুহ

বিশ্বব্যাপী শ্রমিক কর্মচারী তথা মেহনতী মানুষের নতুন করে শপথ গ্রহণের দিন মে দিবস। মে দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। প্রতিবছরই এই শ্রমিক সংহতি দিবস স্বস্ব দেশের রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নতুন আঙ্গিকে উপস্থিত হয়। আমাদের দেশের বা আমাদের রাজ্যের এবারের মে দিবস বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই মে দিবস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা দীর্ঘ শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

শ্রেণীগতভাবে শ্রমিকের আবির্ভাব ঃ যন্ত্র যাদের জীবিকা কেড়ে নিয়েছে এমন কারিগর, শিল্পী, জোলা, তাঁতী, কামার, জমি থেকে বিতারিত নিরন্ন মানুষরা কারখানার দরজায় ভীড় করেছেন অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে। বৃটেনে শিল্পের বিকাশ এবং শ্রমিক শ্রেণীর বৃদ্ধি শুরু হয় ১৭৬০ সালের পর, ফ্রান্সে ১৭৮৯ এবং জার্মানিতে ১৮০০ সালের পর। শিল্পের বিকাশ সত্বেও মোট শ্রমিকের মধ্যে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যাই বেশী ছিল। যন্ত্রের সংখ্যা যত বাড়ে মজুরীর পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে মজুরী বৃদ্ধির দাবি প্রথম যুগের দাবি ছিল। পুঁজিপতির মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকের কাজের সময় বাড়িয়ে শ্রম নিংড়ে নেওয়া হত। অধিকাংশ শিল্পেই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করানো হতো শ্রমিকদের। এরই সঙ্গে ছিল অসহনীয় পরিবেশ, তুলোর আঁশ, আলো বাতাসের অভাব, ধুলোবালি, কানে তালা লাগানো মেশিনের শব্দ ইত্যাদি শ্রমিকের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করতে শুরু করে। বিকশিত পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রবেশ করায় শিল্প কারখানাগুলিতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। প্রথম দিকের ১০-২০ জনের কারখানা ১০০-১৫০ জনের হয়, শিল্প বিপ্লবের যুগে এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪-৫ হাজার শ্রমিকের কারখানায় পরিণত হয়। শিল্পোন্নত দেশে মোট কর্মরত মানুষের মধ্যে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দেশের মোট সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমিকের অবদান বাড়ে এবং বাড়ে সামাজিকভাবে শ্রমিকের গুরুত্ব। মার্কস-এর কথায়—"শ্রমিকেরা ইতোমধ্যেই একটা জয় হাসিল করেছেন—সেটা হল সংখ্যা"। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই চিত্র ছিল বিপরীত। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে যে ভারতকে পৃথিবীর শিল্পের কারখানা বলা হত, যার মসলিন, রেশম, পশম ইত্যাদি দ্রব্য পশ্চিম আফ্রিকা, মিশর বা মধ্য এশিয়ার বাজারে সমাদৃত ছিল—১৯ শতকের গোড়াতেই তার শিল্প জগতের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। বৃটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের অবাধ প্রবেশ আর ভারতীয় দ্রব্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক চাপানো আমাদের শিল্প ধ্বংসের অন্যতম কারণ। ফলে লাখে লাখে কারিগর, মিস্ত্রি, তাঁতী, কুমার, কামার-শহর গ্রাম নির্বিশেষে কৃষিতে ভীড় করতে শুরু করে। ১৮৫৪-তে বাংলায় ও বোম্বাইতে চটকল ও সুতাকল তৈরী হয়। ১৮৫৯ আমেদাবাদে সুতাকল স্থাপিত হয়। এই সময়ে চটকল, সুতাকল, রেল এবং খনিতে কিছু শিল্প শ্রমিকের সমাবেশ ঘটে।

আন্দোলন সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণী ঃ ১৭৫০-এর দশকে ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে সুতাকলে স্পিনার এবং পশম শিল্পের শ্রমিকেরা ইউনিয়ন করেন। ১৭৯২ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার জুতা প্রস্তুতকারক, বাল্টিমোরের দর্জি, নিউ ইয়র্কের ছাপাখানার শ্রমিকরা ইউনিয়ন করেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী বা আমেরিকায় স্থানীয় শিল্প ভিত্তিক একই পেশায় নিযুক্তরা ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে অঞ্চল জেলায় ছড়িয়ে পরে। এই আঞ্চলিক ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট ইউনিয়ন যুক্ত হতে থাকে। অর্থাৎ নিজস্ব কারখানা বা স্থানীয় চেতনা থেকে শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৮৬০-এর দশকে আমেরিকায় জাতীয় ভিত্তিতে ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৮৬৬ সালে বাল্টিমোরে তৈরী হয় ৬০ হাজার শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বকারী ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন। ১৮৬৮শে বৃটেনে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়।

ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে শ্রমিকরা মেশিনকে তাদের শত্রু মনে করে মেশিন ভাঙ্গার আন্দোলন করেছিলেন। এই আন্দোলন সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরেছিল। এই আন্দোলন ভ্রান্ত হিসাবে পরিগণিত হলেও মালিকদের কাছ থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। কাজের পরিবেশের কিছুটা উন্নতি ঘটেছিল এবং সর্বপরি উগ্র মুনাফার লালসার বিরুদ্ধে একটা হুঁশিয়ারি হিসাবে কাজ করেছিল এই আন্দোলন।

ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মূলতঃ বেতনবৃদ্ধির দাবিতে এবং কাজের সময় কমানোর দাবিতে স্থানীয়ভাবে ধর্মঘট হতে থাকে। আমেরিকায় ১৮২৫ সালে জাহাজ তৈরীর কারখানায় ধর্মঘট হয়। ১৮৩৩ সালের পরে অসংখ্য ধর্মঘট হয় মজুরী বৃদ্ধি এবং ১০ ঘণ্টা কাজের দাবিতে। এই ধর্মঘটগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিল ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যার বিচারে ধর্মঘটীর সংখ্যা বেশী থাকত, অন্যদিকে এক কারখানায় বা মিলে ধর্মঘট হলে অন্য স্থানীয় বা দূরবর্তী মিল সামিল হয়ে যেত।

পুঁজিপতির লক্ষ্য শ্রমিককে বেশী সময় কাজ করিয়ে, উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জন করা, আর শ্রমিকের লক্ষ্য কাজের সময় কমানোর। শ্রমিক মালিকের দ্বন্দ্ব আজও বিদ্যমান। সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর এই লড়াইয়ের পাশাপাশি বৃটেনের শ্রমিকরা তিরিশ বছর লড়াই করে ১৮৬৪তে ১০ ঘণ্টার কাজের আইন পাশ করায়। অস্ট্রেলিয়াতে শ্রকিরা আট ঘণ্টা কাজের দিন আদায় করে।

আমেরিকার ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন 'আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা আমোদ প্রমোদ, আর আট ঘণ্টা বিশ্রাম'—এই রণধ্বনিতে সোচ্চার হতে শুরু করে। ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে জেনিভাতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক নামে পরিচিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেন্স এ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন। সেখানে কার্ল মার্কসের উদ্যোগে আট ঘণ্টা রোজের আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বের সংগঠিত শ্রমিকদের আওয়াজে পরিণত করা হয়।

১৮৮১ সালে ফেডারেশন অফ অর্গানাইজড ট্রেডস এ্যান্ড লেবার ইউনিয়নস অফ ইউএসএ এ্যান্ড কানাডা নামে একটি জাতীয় শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮৮৬ সালে তার নাম হয় আমেরিক্যান ফেডারেশন অফ লেবার। ১৮৮৪ সালে এই সংগঠন তার অনুগামী ইউনিয়নের জন্য প্রস্তাব দেয়'১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে আট ঘণ্টাকেই দৈনিক কাজের দিন হিসাবে আইনত গণ্য করা হবে। সমস্ত শ্রমিক সংগঠন যেন উল্লিখিত তারিখের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজ নিজ এলাকার আইন কানুন পরিচালনা করেন। এই দাবি ব্যক্তি মালিকের গন্ডি পেরিয়ে রাষ্ট্র শক্তির কাছে তুলে ধরা হয়। ১৮৮৫ সালে ফেডারেশন আবার ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে সমস্ত ইউনিয়নকে ১৯৮৬ সাল থেকে আট ঘণ্টা রোজ চালু করবার অনুরোধ জানায়। ১৮৭৭ সালে রেল শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙ্গার নৃশংসতার মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠে নাইটস অফ লেবার নামে একটি সংগঠন। আট ঘণ্টার কাজের দিনের দাবিতে শ্রমিক শ্রেণী যতই উদ্দীপ্ত হয়েছে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে এই দুটি সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ফেডারেশন ১ মে দিনটিকে ধর্মঘট করে পালনের দাবি জানায় এবং শ্রমিকদেরও ধর্মঘটের মেজাজ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নাইটস অফ লেবারের নেতারা গোপনে ধর্মঘট থেকে পিছিয়ে গেলেও সমগ্র আমেরিকায় ধর্মঘট হয়। অসংগঠিত শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটে সামিল হয়।

শিকাগো ছিল আট ঘণ্টা কাজের দাবির আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি। প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক জমায়েত হয়ে মিছিল করে। জাতি, ধর্ম, ভাষার ভেদাভেদ বিলিন করে শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বজয়ী মিছিল এগোতে থাকে। মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুরা অর্থাৎ মালিক শ্রেণী এবং শিকাগো সরকারের সম্মিলিত শক্তি সংগ্রামী নেতাদের ধ্বংস করে ফেলতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। ৩রা মে ম্যাক কমিক রিপার কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক সভায় পুলিশ নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পরে ছয় জন শ্রমিক শহীদ হয় এবং বেশ কয়েকয়েকজন আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ৪ঠা মে হে মার্কেট স্কোয়ারে একটি সভা ডাকা হয়। এই সভায় উপস্থিতি আশানুরূপ হয়নি দেখে সভাটা হে মার্কেট স্কোয়ারের একটু দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। রাত বেশী হয়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের সংখ্যা কমতে থাকে। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। মানুষ ছোটাছুটি শুরু করে। পুলিশ সভা ভেঙে দেওয়ার হুকুম দেয়। এই সময় শান্তিপূর্ণ সভা স্থলে প্রশাসনের চক্রান্তে পুলিশের উপর একটা বোমা পরে। কয়েকজন পুলিশ নিহত হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বিপুল গুলি বর্ষণ শুরু হয়। প্রচুর মানুষ আহত হয়। এই বোমা বর্ষণ অ্যানাকিষ্ট, সোস্যালিস্ট এবং কমিউনিস্টদের কাজ বলে প্রচার শুরু হয়। শ্রমিক মহল্লাগুলোতে পুলিশি অত্যাচার শুরু হয়।

এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন শ্রমিক নেতা গ্রেপ্তার হন। বিচারের দীর্ঘ প্রহসনের পরে পার্সনস, স্পাইজ, ফিসার এবং এঙ্গেলের ফাঁসি ঘোষিত হয়। স্পাইজ তাঁর ভাষণে বলেন—'তোমরা যদি ভেবে থাক যে আমাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তোমরা শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করবে, তবে দাও ফাঁসি—এই স্ফুলিঙ্গ থেকে যে আগুন জ্বলবে সে আগুন জ্বলবে তোমাদের সামনে, পিছনে, সর্বত্র, মাটির নীচের সেই আগুন, তাকে তোমরা নিভাতে পারবে না কিছুতেই।' শুধু মার্কিন মুলুক নয় সারা দুনিয়ার সংগঠিত শ্রমিক-এর প্রতিবাদ করল। ১১ নভেম্বর পার্সনস, স্পাইজ, ফিসার এবং এঙ্গেলের ফাঁসি হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা জীবনের জয়গান করেছেন। বলেছেন—'তোমরা আমাদের কণ্ঠরোধ করছো কিন্তু এই নৈঃশব্দ পরম বাগ্ময় হয়ে উঠবে। আমাদের জীবন কোটি কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে তোমাদের উচ্ছেদ করার সংগ্রামে।'

ফরাসী বিপ্লবের স্মরণীয় দিন ১৪ই জুলাই। ১৯৮৯ সালের ঐ দিনে প্যারিসে বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম বৈঠক বসে। ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি সেই বৈঠকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। কংগ্রেস প্রস্তাব দেয়—'সমস্ত দেশের সমস্ত শহরের মেহনতী মানুষ তাদের নিজ নিজ সরকারের কাছে ৮ ঘণ্টা কাজের সময় আইন করে বেঁধে দেবার জন্য দাবি উত্থাপন করবে। যেহেতু ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বরে সেন্ট লুই-এ আমেরিকান ফেডারেশন আর লেবার-এর সম্মেলনে ১৮৯০ সালের ১লা মে তারিখে অনুরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত ইতোপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে, সেহেতু উক্ত তারিখটিকেই আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন হিসাবে স্থির করা হল। নিজ নিজ দেশের অবস্থানুযায়ী বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অবশ্য কর্তব্য।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১৮৯০ সালে মে দিবস পালিত হয়। আমেরিকায় নির্মাণ শিল্পের কর্মীরা সহ বিভিন্ন কারখানায় ধর্মঘট পালিত হয়। জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্কের বহু কারখানায় ধর্মঘট পালিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুসজ্জিত মিছিল হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর কাছে মে দিবস হয়ে ওঠে সংগ্রামের দিন।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ফিরে দেখা ঃ ১৮৫৪ সালে বাংলায় প্রথমে রেলপথ চালু হয়। ১৮৬২ সালে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে হাওড়ার রেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। মে মাসের এই ধর্মঘটে প্রায় চারশ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। এই ধর্মঘটের সমর্থনে বাংলাদেশের সংবাদপত্র এগিয়ে এসে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য কর্তৃপকে অনুরোধ জানায়। ১৮৭৭ সালে প্রথম ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট করার দাবি প্রস্তাব রাখেন বোম্বের সাপুরজী বেঙ্গলী। তিনি কারখানা আইনের একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরী করে বিলিও করেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা শশীপদ ব্যানার্জী কারখানা আইনের জন্য বিভিন্ন সভায় দাবি উত্থাপন করেন। এই সব ঘটনার ফলে ১৮৮১ সালে ভারতে প্রথম কারখানা আইন তৈরী হয়। ১৮৮৪ সালের সেপ্টেম্বরে বোম্বের সুতাকল শ্রমিকদের এক বিরাট সমাবেশে কাজের ঘণ্টা কারখানা আইনে বিধিবদ্ধ করার দাবি জানানো হয়।

১৮৯০ সালের এপ্রিলে বোম্বের সুতাকলের ১০ হাজার শ্রমিকদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশ থেকে সপ্তাহে ১ দিনের ছুটির দাবি উত্থাপিত হয় এবং মালিকরা এই দাবি মেনে নেন। উল্লেখ্য ১৮৮৯ সালের মার্চ মাসে বৃটেনের ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতাকলের শ্রমিকরা ভারতের শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। ১৮৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার একটি কমিশন গঠন করে। '৯১ সালে কমিশন নতুন কারখানা আইন প্রস্তাব করে এবং '৯২ সাল থেকেএই আইন কার্যকরী হয়। এই আইনে নারী শ্রমিকদের জন্য ১১ ঘণ্টা কাজ এবং দেড় ঘণ্টা বিরতি, শিশু শ্রমিকদের ৭ ঘণ্টা কাজ। সপ্তাহে ১ দিন ছুটি। তবে পুরুষ শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয় না।

১৯০৫ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকরা পুনরায় 'সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া'-এর কাছে এক প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে পুরুষদের কাজের ঘণ্টা বেঁধে দেয়ার দাবি জানায়। ১৯১১ সালে মালিকরা পুরুষদের ১২ ঘণ্টা এবং শিশু শ্রমিকদের জন্য ৬ ঘণ্টা কাজের সময় আইনত স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

১৯০৮ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তার এবং পরে ছয় বছর জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল বোম্বাই-এর সুতাকল ও অন্যান্য অংশের শ্রমিকরা এবং সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জি.আই.পি রেলওয়ে শ্রমিকরা। শুধু ছয় দিনের ধর্মঘট আর বিক্ষোভ মিছিল নয়, বৃটিশ শাসকদের ফৌজদের সঙ্গে বোম্বাই শহরের রাজপথে ব্যারিকেডের লড়াই হয়। বৃটিশ শাসকদের আক্রমণে এই লড়াইয়ে শহীদ হন অসংখ্য শ্রমিক। লেনিন লিখেছিলেন—'ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সচেতন রাজনৈতিক গণসংগ্রামের স্তরে প্রবেশ করল।'

বোম্বাইয়ের সুতাকলের পঞ্চাশটি ইউনিয়নের সম্মিলিত সম্মেলন থেকে দশ ঘণ্টা কাজের দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সুতাকলের শ্রমিকরা একমাসব্যাপী ধর্মঘট করে মালিক শ্রেণীর কাছ থেকে ১০ ঘণ্টা কাজের দাবি আদায় করে নেয়।

১৯২০ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় সংগঠন সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রথম সম্মেলন থেকে শ্রমিক আন্তর্জাতিক সংহতি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

ভারতে প্রথম মে দিবস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের বাড়িতে রক্ত পতাকা উত্তোলিত হয় এবং মাদ্রাসের সমুদ্র সৈকতে সভা করা হয়।

১৯২৬ সালে মীর আব্দুল মজিদের নেতৃত্বে টাঙ্গাওয়ালা শ্রমিকেরা মে দিবস উদ্‌যাপন করেন, রক্ত পতাকা উত্তোলিত হয় এবং বহু পোস্টার পরে। ১৯২৮ সালের মে দিবস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে শোভাযাত্রী হয় এবং ময়দানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শাসকশ্রেণীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই ধারাবাহিকভাবে মে দিবসের কর্মসূচী প্রতিপালিত হতে থাকে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও মে দিবস ঃ বিগত চার বছর কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন চরম দক্ষিণপন্থী মৌলবাদী শক্তি। শ্রমিক-কর্মচারী মেহনতী মানুষের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকার সমূহ হরণ করতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় শাসকশ্রেণী।

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

তোমার আকাশ দাও কবি

রবীন্দ্রনাথের বিরাট সার্বভৌমত্ব আজও ইতিহাসের ভবিষ্যতে নিহিত—বিষ্ণু দে

শাশ্বতী মজুমদার

''কল্যাণীয়েষু, আমার কাছে মাঝে মাঝে অনুরোধ আসছে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লিখতে হবে। অর্থাৎ একটা পথ দেখাতে হবে অসাধ্য জটিলতার মধ্য দিয়ে। আমি তো কিছুই ভেবে পাই নে।

আমাদের অবস্থাটা এই—শাসনশক্তি একদিকে মারণ-উচাটন সমস্ত তোড়জোড় নিয়ে কড়া আইন আর লাল পাগড়ির বেড়া তুলে কেল্লা ফেঁদে বসে আছে। দেশকে বশীকরণের এই একমাত্র উপায়ের প্রতিই তার চরম বিশ্বাস। আর একদিকে আছে রিক্ত হাতে নিঃস্ব পকেটে নিঃসহায়ের দল। তারা অহিংস্র শক্তিকেই পরম পরিত্রাণ বলে আশ্রয় করবার উপদেশ পায়, কিন্তু তার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারছে না।'' ১৯৩৯ সালের ৫ নভেম্বর কবি অমিয় চক্রবর্তীকে মংপু থেকে লেখা চিঠি শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথ এইভাবে। বলছেন, ''মানব-হননের অসংখ্য তোরণ নির্মাণ করতে করতে পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বিজয় অভিযান কুচকাওয়াজ করে চলেছে।'' ''হিংস্র শক্তির যে নিদারুণ জাগরুকতা'' তা সভ্যতার প্রতি তার বিশ্বাসকে টলিয়ে দিচ্ছে। এর কিছুকাল পরে মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'সভ্যতার সংকট' লিখবেন তিনি। লিখবেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'।

অমিয় চক্রবর্তীর ওই চিঠিতেই আরও লিখছেন তার নিজের পরাধীন দেশবাসী সম্বন্ধে—''কোটি কোটি লোক অর্ধাসনে ক্লিষ্ট, অশিক্ষিত, আরোগ্য বিধানহারা, তাদের পানীয় জল কোথাও শুষ্ক, কোথাও দূষিত।'' লিখছেন, ''দেশে কী নেই তা বললুম, কিন্তু যা আছে, সর্বত্রই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিচ্ছেদ। দুর্বলতা থেকেই এর উদ্ভব, দুর্বলতাকেই এ পোষণ করে রাখে। নিজের দায়িত্বকে যাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদেরই ঘটে এই দুর্বলতা। শক্তি-শাসনের এই বাহনটা দানাপানি খেতে রইল রাজার আস্তাবলে, আমাদের অন্নবস্ত্র অনেক কিছুর ক্ষয় হবে কিন্তু এর বিনাশ হবে না।'' নানা প্রবন্ধে, নানা উপন্যাসের ন্যারেটিভে এবং অবশ্যই উল্লেখ্য, অসংখ্য ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে এইভাবেই সমকালের ভাষ্য লিখছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দ্রষ্টার মতো অমোঘ, অভ্রান্ত সেই স্বর।

শালপ্রাংশু সেই বৈদগ্ধের শিকড় দেশজ-লোকজ সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতির গভীরে। ''জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর / আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী / আপনারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি''—বলতে পারেন তিনিই। মুক্ত চিন্তার আলোয় নিজেকে মেলে ধরতে খুলে রাখেন বিশ্বের জানলা।

দীর্ঘ জীবনে আত্মতৃপ্তির গণ্ডী কেটে কোথাও দাঁড়িয়ে যান নি, বরং বারবারই নিজের মানস কাঠামো ভেঙে নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়েছেন, পুনর্জন্ম নিয়েছেন বার বার একজীবনে—''হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোথা অন্য কোনোখানে।''

* * *

''সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো। যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক, যা প্রথাগত, যা দেশেকালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র, সে সমস্তের ঊর্ধ্বে গেছে তাঁর দৃষ্টি। নীতির চেয়ে সত্যকে বড় করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে।''—বুদ্ধদেব বসু।

১৯২১ সালে এন্ড্রুজকে চিঠিতে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ—"I love India, but my India is an idea and not a geographical expression. Therefore I am not a patriot—I shall ever seek my compatriots all over the world" স্বদেশপ্রেমের থেকে পৃথক করে জাতি-রাষ্ট্রের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করার এই দৃষ্টিভঙ্গি সেই ঔপনিবেশিক যুগে সমালোচিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আজও কি আমরা এই কথার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে প্রস্তুত? বিশেষত যখন এই উপমহাদেশে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের তিক্ততা বাড়তে থাকে এবং আমাদের দেশপ্রেমের পারদ চড়তে চড়তে স্বাভাবিক বুদ্ধির সীমাকে অতিক্রম করে বোধহীন উন্মত্ততায় পৌঁছে যায় তখন মনে হয় এই ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথকে অন্তরে নিতে পারেনি, বাইরের দরজায় দাঁড় করিয়ে পুজো সেরেছে।

ঔপনিবেশিক সংস্পর্শে এবং ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিরোধ স্পৃহায় জাতি গঠনের ভাবনা নবজাগরণের সময় থেকে ইওরোপীয় নেশন-স্টেটের আদলেই গড়ে উঠেছিল। 'নেশন কী' (১৯০১ সাল) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন, ইউরোপের ক্ষেত্রে 'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। এখানে রবীন্দ্রনাথের শব্দবন্ধে লক, হবস, অ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তারা নেশনকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। কিন্তু বিশ্বের তৎকালীন ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে তাঁর চোখ এড়ায় না 'মিথ্যার দ্বারা হউক, ভ্রমের দ্বারা হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড় করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহাই নেশনের ধর্ম, প্যাট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন। নেশনের মেরুদণ্ড স্বার্থ। স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করবেই।... এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এ স্থলে বিরোধ, বিদ্বেষ, অন্ধতা, মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন, এ সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।" (বিরোধমূলক আদর্শ; ১৯০১ সাল)

এর পাশাপাশি "One of the first systemic expounders in India of the principles of nationalism", যাকে বলা হয় সেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভারত কলঙ্ক'-তে পাব 'জাতি প্রতিষ্ঠা'র দুটি উপাদান—১। 'আমি হিন্দু তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল।' এবং ২। 'হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে

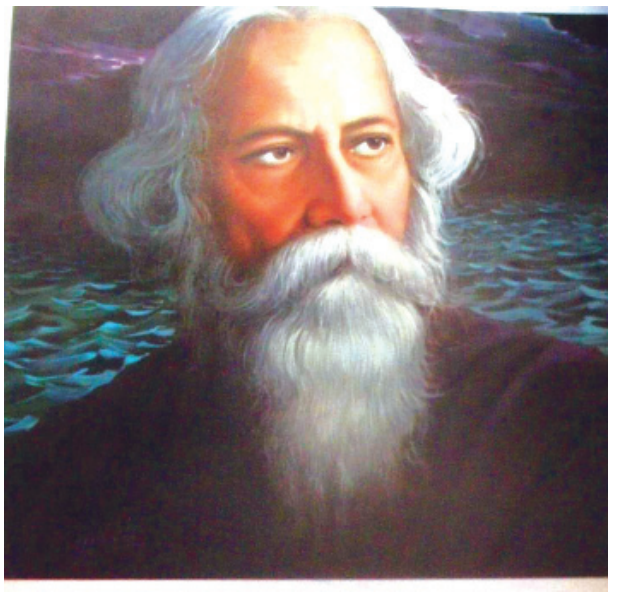

আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয়, করিব।" ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে পাশ্চাত্যের বলদর্পী নেশনের ধারণার আধারে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারা, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উপাদানের সঙ্গে সমান্তরালভাবেই আগাগোড়া ছিল। এই জবরদস্তি ঐক্যবিধান বা অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থেকে উদ্ভূত পরজাতিবৈরীতা থেকে রবীন্দ্রনাথ মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, হিন্দু সমাজ ও ধর্ম যদিও দীর্ঘদিনই তাঁর চেতনার আশ্রয়স্থল হিসেবে থেকে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রম প্রসারের মাধ্যম নেশন স্টেটের অপর পিঠেই অবস্থান সাম্রাজ্যবাদের, অথচ নেশনের মডেলকেই ঔপনিবেশিক শাসনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ব্যবহার করায় যে স্ববিরোধ রবীন্দ্রনাথ তা স্বকীয় ভাবনায় বুঝেছিলেন।

আরেকটি বিষয় রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছিল, ''যেহেতু ভারতীয় সমাজ ভেদবহুল, যেহেতু এখানে নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা জাতি, সেই জন্যেই ভারতের মর্মের বাণী হচ্ছে ঐক্যের বাণী।... বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদই পাকা করে রেখেছে, এইজন্যই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্য আচারকে অতিক্রম করে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা।'' বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া ঐক্যের চাপে ভিতরের ভেদকেই বাড়িয়ে তুলবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং ভারতবর্ষের বৈচিত্রকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন, আধিপত্যবাদী নেশনের একটি জাতির অধীনে অনেক ক্ষুদ্র জাতির, একটি প্রধান ভাষার কাছে অন্যান্য ভাষার, একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির অধীনে অনেকগুলি প্রান্তিক সংস্কৃতির (১৯২৫ সালে লেখা) আত্মবিলোপের পরিণতি তাঁর কাছে কখনোই কাম্য ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা বিরোধী ভাবনার আরও পরিণত প্রকাশ পাওয়া যায়—Nationalism প্রবন্ধ মালায়—Nationalism in India, Nationalism in West এবং Nationalism in Japan। পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদকে Carnivorous, Connibatistic বলতেও দ্বিধা করেননি। বিজ্ঞানের শক্তি নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে রেখে কিভাবে no-nation দেশের ওপর তারা শোষণ কার্যকরী রাখে বলেছেন। বক্তব্য এসেছে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালের অনেক পরে গত শতাব্দীর ৮০-৯০ দশকে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের 'Imagined Communities' বা এরিক হবসবমের 'Nation and Nationalism since 1870' প্রভৃতির হাত ধরে নেশনের উত্থান, প্রকৃতি নিয়ে যখন ব্যাপক চর্চা শুরু হয় তখন রবীন্দ্র ভাবনার সঙ্গে অদ্ভুত মূলতগত সঙ্গতি লক্ষ্য করে আশ্চর্য হতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতি এখনও হয়তো সেই পরিপক্কতা লাভ করেনি, নিজের সময় থেকে অনেক দূর তাকিয়ে তাঁর বক্তব্য সেজন্যই আজও আমরা বুঝে উঠতে পারি না। তাই আজও রবীন্দ্রনাথের ''মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ'' লাঞ্ছিত হয় 'হিন্দুত্ব'-এর গেরুয়া ফেট্টিধারী পাণ্ডাদের হাতে, হিন্দু, হিন্দি-হিন্দুস্থান স্লোগানে। 'গুণ্ডা ন্যাশানালিজম' শব্দটা খবরের কাগজের পাতায় উঠে আসে যখন ভিন্নমত ব্যক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের খুনের হুমকি দেওয়া হয়, জেলে পোরা হয়, যখন গোহত্যাকারী সন্দেহে, বা গোমাংস ভক্ষণের অপরাধে অনায়াসে মানুষ খুন করা যায়, দলিত জীবনের অপমান সইতে না পেরে আত্মহননকেই বেছে নেয়, একটি সম্প্রদায়কে শায়েস্তা করার জন্য সেই সম্প্রদায়ে একটি শিশু কন্যাকে গণধর্ষণ করে হত্যাকে বৈধতা দেবার চেষ্টা চালানো হয়, যখন সেনাবাহিনীর গাড়িতে এক কাশ্মীরি যুবককে মানব ঢাল হিসেবে বেঁধে জঙ্গি খুঁজতে অভিযান চালানোকে ঠিক বলে সেনানায়ককে সদম্ভে ঘোষণা করতে শোনা যায়, যখন কৃষকদের আত্মহত্যার দিকে আর যুবকদের বেকারত্বের অন্ধগলিতে ঠেলে দেওয়ার জন্য নয়া উদারনৈতিক ফাঁদ পাতা হয়, যখন দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে যে সরকার তাকে কুর্ণিশ না করলে দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না, তখন এই ভরা অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথের দিকেই তাকাতে হয়—বিষ্ণু দে'র ভাষায় বলতে হয় ''তোমার আকাশ দাও কবি, দীর্ঘ আশি বছরের, আমাদের ক্ষীয়মান মানসে ছড়াও''।

* * *

সে যুগের নেশন-ওয়ালাদের উল্টোমেরুতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বিকল্প ধারার অনুসন্ধান করেছিলেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা ভারতীয় সমাজের মধ্যে। কত শত বিদেশী আক্রমণ, কত রাজার শাসনকাল পেরিয়ে যে সমাজ টিঁকে ছিল তার শক্তির উৎস কী রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চেয়েছিলেন। আমাদের মনে পড়ে যায় মার্কস কথিত প্রাক-ধনবাদী Asiatic Mode of Production-এর সমাজের কথা। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে না দেখে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক দিক থেকে দেখেছিলেন এবং বহুদিন পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম হিন্দু সমাজের ভাবনার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে দোলাচল ছিল বরাবরই। ১৮৯০ সালে পারিবারিক জমিদারি দেখাশুনার কাজে শিলাইদহে থাকার সময় নিম্নবর্গের এবং মুসলমান প্রজাদের জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। মুসলমানদের জাজিম তুলে বসতে দেওয়া বা নমঃসূদ্রদের সমাজে অন্ত্যজ করে রাখায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন। উনবিংশ শতকের নব্বই দশকে তিনি হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। আবার শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে (১৯০১) কঠোর হিন্দু অনুশাসন প্রচলিত হয়েছে। কায়স্থ শিক্ষক কুঞ্জলাল ঘোষকে ব্রাহ্মণ ছাত্ররা প্রণাম করবে কিনা প্রশ্ন উঠলে রবীন্দ্রনাথ 'সংহিতা'-র উপদেশ অনুসরণ করতে বলছেন কিন্তু একইসঙ্গে লিখছেন ''অব্রাহ্মণকে প্রণামের ব্যবস্থা কি কোথাও নাই?''

বিংশ শতকের প্রথমেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠল তখন রবীন্দ্রনাথকে দেখা গেল আন্দোলনের পুরোভাগে। অসংখ্য উদ্দীপক দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, প্রবন্ধ, বক্তৃতায় মুখর হলেন প্রতিবাদে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের আবর্তে দাঁড়িয়েই তিনি দেশের ঐক্যের কথা ভাবতে গিয়ে দেখলেন—''জাজিম তোলা আসনে মুসলমান বসেছে, তারপর এদের ডেকে বলেছি 'আমরা ভাই, তোমাকেও আমার সঙ্গে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।' তখন হঠাৎ দেখি অপরপক্ষ লাল টকটকে নতুন ফেজ মাথায় দিয়ে বলে, 'আমরা পৃথক'। আমরা বিস্মিত হয়ে বলি, রাষ্ট্র ব্যাপারে পরস্পর পাশে দাঁড়াবার বাধাটা কোথায়? বাধা ঐ হাজিম তোলা আসহনে বহুদিনের মস্ত ফাঁকটার মধ্যে।'' (কালান্তর) শুধু মুসলমান নয়, দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগ কোথায় এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেলেন। কিন্তু এই সময়েই প্রাচীন হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতির মোহ থেকে তাঁর মুক্তি ঘটছে। 'গোরা' (১৯০৭ সাল) উপন্যাসে গোরা বির্বত এক অর্থে রবীন্দ্রনাথেরও বিবর্তন। ''মা, তুমিই আমার মা, যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।' লিখলেন,

''দেখিতে পাওনা তুমি, মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে— / অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে। / সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক / আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান— / মৃত্যুমাঝে হবে তবে জিতাভস্মে সবার সমান। (অপমানিত; ১৯১০ সাল)

'ঘরে বাইরে' (১৯১৬ সাল) উপন্যাসে নিখিলেশের জবানীতে বললেন, বলে, ''আমার ভারতবর্ষ শুধু ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নিচের লোক যত নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষ মরছে।'' 'ঘরে বাইরে উপন্যাসে অগভীর, বাগাড়ম্বরপূর্ণ, উত্তেজক, আবেগসর্বস্ব রাজনীতির পরিণাম কত ভয়ঙ্কর হতে পারে দেখালেন। আবার 'চার অধ্যায়'-এ হিংসাত্মক রাজনীতির আধুনিক হৃদয়হীন যান্ত্রিক দিকটি উন্মোচিত করলেন, যান্ত্রিকতায় দ্বিধায় দীর্ণ 'অতীব' হত্যা করে তার প্রেম 'এলা'কে। রবীন্দ্রনাথ দেখালেন—এই হিংসার রাজনীতিতে কোথায় আত্মত্যাগ, কোথায় কূলবৈরিতা? আজকের ভারতবর্ষেও আমাদের পরিপার্শ্বে কি এই সমস্যাগুলিকেই আমরা দেখছি না?

'অচলায়তন' নাটকে (১৯১১ সাল) তিনি শোনপ্রাংশু আর দর্ভক অর্থাৎ অন্ত্যজ আর ভিন্ন ধর্মের মানুদের দিয়ে হিন্দু সমাজের অচলায়তন তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন কিন্তু কেমন হবে সেই নতুন সমাজ, সেই খোঁজে ক্লান্তিহীন তিনি। ভারতের মরমিয়া সাধক, সুফী সন্তদের পথে তিনি মানুষকে মেলাতে চেয়েছিলেন।

জীবনের শেষপ্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ গেলেন সোভিয়েত ভ্রমণে (১৯৩০ সাল) সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা চিরভাস্বর হয়ে থাকল 'রাশিয়ার চিঠি'-তে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের রূপ তিনি সেখানে দেখে অভিভূত হলেন। কিভাবে তারা একটা গোটা

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

নয়া আঙ্গিকে শ্রমিক সংহতি দিবস

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির নির্দেশ অনুযায়ী নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতি সমূহ কার্যকর করতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে শ্রমিক কর্মচারী মেহনতী মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত। দেশের ১ শতাংশ ধনী ব্যক্তির ভাঁড়ারে সমগ্র দেশের অর্ধেকের বেশি সম্পদ। সমাজজীবনে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দ্রুত হারে বাড়ছে। সমস্ত শ্রম আইন, জনকল্যাণমূলক আইন পরিবর্তন করে শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। স্থায়ী শূন্যপদে অস্থায়ী চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে কর্মসংস্থানের সমস্ত সুযোগকে সঙ্কুচিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবামূলক কাজের ব্যাপক বেসরকারীকরণ হচ্ছে। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাসমূহকে ন্যূনতম মূল্যে বেসরকারী কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে। পেট্রোল, ডিজেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য আকাশচুম্বী। সমগ্র দেশেই রাষ্ট্র কাঠামোকে ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের মরীয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো সমগ্র দেশেই তীব্র আক্রমণের মুখে। দেশের অর্থনীতি চরম সঙ্কটের মধ্যে নিমজ্জিত। শিল্প উৎপাদনের হার নিম্নমুখী। দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক শিল্প গভীর সঙ্কটে। সরকার পোষিত শিল্পপতিরা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের হাজার হাজার কোটি টাকা লুঠ করে দেশান্তরী হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কর্পোরেট সংস্থাকে কর ছাড় দিচ্ছে সরকার আর সাধারণ মানুষের ভোগ্যপণ্যের উপর থেকে ভরতুকী হ্রাস করছে। সমগ্র দেশে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তি সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হানছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের মেহনতী মানুষের স্বার্থ বিরোধী আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বাংশের খেটে খাওয়া মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল। শ্রমিক কর্মচারীরা আন্দোলন-সংগ্রাম ধর্মঘট করছে অর্জিত অধিকার সমূহকে রক্ষা করা, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত কর্মসূচীসমূহকে কার্যকরী করা, দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করা এবং সর্বোপরি দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষা করার লড়াই চলছে। দেশের কৃষিজীবী মানুষের লড়াই সংগ্রাম এই সময়কালে সামগ্রিকভাবে মেহনতী মানুষের আন্দোলন সংগ্রামে বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে। এই প্রেক্ষাপটেই এবারের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস সমগ্র দেশব্যাপী বিশেষ উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবেই মে দিবসে শপথ গ্রহণ করেছে চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশকে বাঁচাতে হবে।

আমাদের রাজ্যের শাসকশ্রেণী শ্রমিক-কর্মচারী মেহনতী মানুষের ঐতিহাসিক মে দিবস পালনের গোড়াতেই আঘাত হানে। সরকারের পরামর্শে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ১ মে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিসহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সরকারের এবং নির্বাচন কমিশনের কোনো প্রতিক্রিয়া না থাকায় কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আদালতের দ্বারস্থ হয়। সমগ্র রাজ্যব্যাপী শাসকদলের পক্ষ থেকে শুরু হয় গণতন্ত্র নিধন প্রক্রিয়া। ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশনের নানান অসাংবিধানিক পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও আদালতে যায়। পরবর্তীকালে আদালতের রায়ে ১ মে নির্বাচন করতে পারেনি শাসকদল নির্দেশিত নির্বাচন কমিশন। ফলে রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের এবারের শ্রমিক সংহতি দিবস বিশেষ তাৎপর্য নিয়েই উপস্থিত হয়। এবারের মে দিবসের কেবল আট ঘণ্টা শ্রমের দাবি, কেবল অর্জিত অধিকারসমূহ রক্ষা বা গণতন্ত্রকে রক্ষার লড়াইয়ের শপথই হয়নি, এই রাজ্যের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকাকে রক্ষা করতে গেলে এই রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষা করতে গেলে রাজ্যের শাসক গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করার শপথ গ্রহণ করেছে শ্রমিক কর্মচারীরা। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন সমিতি এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দপ্তরগুলিতে বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর উপস্থিতি বিভিন্ন আঙ্গিকে শ্রমিক সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। কলকাতার কর্মচারী ভবনসহ দূরবর্তী কোনো জেলার প্রত্যন্ত ব্লকে উৎযাপিত মে দিবসের কর্মসূচীতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিপুল পরিমাণ আর্থিক বঞ্চনার নিরসনে অপেক্ষমান বৃহত্তর লড়াই সংগ্রামে সর্বাংশের কর্মচারী সমাজকে যুক্ত করার ঐকান্তিক প্রয়াস গ্রহণের শপথ গ্রহণ করা হয়েছে। □

তোমার আকাশ দাও কবি

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

দেশকে জাগিয়েছে, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে, কর্মে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে দেখে তাঁর আনন্দ ধরে না। যদিও কিছু সমালোচনাও রেখে গেছেন তারই সঙ্গে, কিন্তু এই 'তীর্থ দর্শন'-এই তাঁর 'অচলায়তন' ভাঙার যাত্রা একটা বৃত্তে এসে পূর্ণতা পেল। জীবনের শেষপর্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসে স্থিত রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে ১৯৩১ সালের ২৭ জুন লিখছেন—"য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের কর্মকে মহৎ করে তোলেন—তাঁরা দূরকালের জন্য প্রাণপণ করেন, সর্বদেশের জন্য।" লিখছেন 'মানুষের ধর্ম'।

হেমন্তবালা দেবীকেই এক চিঠিতে ১৯৩৩ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর লিখছেন—তোমাদের হিঁদুয়ানিতে অত্যন্ত বেশি আধুনিকতার ঝাঁজ—তাতে সাবেক কালের পরিণতির মোলায়েম রঙ লাগেনি। মিশনারিদের মতোই ভঙ্গী তোমাদের। যেন হিঁদুয়াতির মোল্লা মৌলবী। গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়। যথার্থ মহা ভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাটা হাড় বের করা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশ্বের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে রুগ্ন সে দেশ—আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই।

আমার কথা ব্রাহ্মসমাজের কথা নয়, কোনো সম্প্রদায়ের কথা নয়, য়ুরোপ থেকে ধার করা বুলি নয়। য়ুরোপকে আমার কথা শোনাই বোঝে না; নিজের দেশ আরো কম বোঝে।... আমি যাঁকে পাবার প্রয়াস করি, সেই মনের মানুষ সকল দেশের সকল মানুষের মনের মানুষ, তিনি স্বদেশের স্বজাতির উপরে।"

আজকের ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের মননের উত্তরাধিকার বহন করতে পারে বামপন্থীরাই। দেশের বুকে আজ যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের পদচারণা, আবেগসর্বস্ব, যুক্তিহীন, মিথ্যার রাজনীতি তাকে পরাস্ত করার জন্য স্থিতধী রাজনীতির প্রকাশ ঘটাতে পারে তারাই।

এই দেশ এই সমাজকে পাল্টাবার মন্ত্র নিয়েছে যারা রবীন্দ্রনাথের মতোই দেশের সমাজকে জানবার-বোঝবার সাধনা করতে হবে তাদের।

ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত 'দাদু' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''ভারতের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা জনাদর পেতে বাধা পেয়েছিলেন একথা মনে রাখা চাই; যে আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তারা ভেদ প্রবর্তক সনাতন বিধির বাইরের লোক,... তারাই যথার্থ ভারতীয়। তারাই বাহিরের কোনো সুবিধা থেকে নয়, অন্তরের থেকে হিন্দু মুসলমানকে এক করে জেনেছিলেন।''

রবীন্দ্রনাথের এই কথা যেন আমরা ভুলে না যাই, ধৈর্য অবলম্বন করে অভীষ্টের দিকে এগিয়ে যাবার পথে জীবনানন্দ দাসের ভাষায় ''আরো স্থির দিক নির্ণয়ের মতো চেতনার / পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ কত দূর অগ্রসর হয়ে গেল...'' যেন জানাতে পারি ইতিহাসের কাছে। □

ধর্মঘটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

মফঃস্বলে ৫০ জন মোট ১৫০ জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুরে ৪০ জন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ লক আপে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের উপর নির্যাতন করা হয়। বেতন কাটা, চাকরিছেদ, সাসপেনশন সবকিছুই নামিয়ে আনা হয়।

এর বিরুদ্ধে কর্মচারী সমাজ সংগঠনের আহ্বানে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যে দপ্তরে কোনো কর্মচারীকে সাসপেন্ড বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে রাজ্যব্যাপী সরকারী প্রশাসনে শুরু হয় অচলাবস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৬ মে ধর্মঘটের সমর্থনে ১২ই জুলাই কমিটি সহ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এগিয়ে আসে। দাবীর সমর্থনে জমায়েত সংগঠিত হয়। অর্থাৎ ১৬ মে-র রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট কার্যত রাজ্যের গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

ধর্মঘটের মুখে দাঁড়িয়ে মহার্ঘভাতা, একজন বরখাস্ত কর্মীর পুনর্বহালের দাবী সরকার মেনে নিলেও, তার দ্বারা কর্মচারী সমাজকে বিভ্রান্ত করা যায়নি। ধর্মঘট পরবর্তী আন্দোলনের চাপে কাটা বেতন ফেরত দানের প্রতিশ্রুতি, সাসপেনশন প্রত্যাহার প্রভৃতি সিদ্ধান্ত নিতে সরকার বাধ্য হয়।

(৫) বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৬ মে ধর্মঘটের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষা ঃ বর্তমান পরিস্থিতির সাথে ১৯৬৮ সালের ১৬ মে ধর্মঘটের পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সেই সময় আন্তর্জাতিক স্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব ছিল। চারটি কেন্দ্রীয় সামাজিক দ্বন্দ্বের তীব্রতাও ছিল। বর্তমানে সোভিয়েত বিলুপ্তি এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য সাময়িকভাবে হলেও সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে সৃষ্ট সাব প্রাইম সঙ্কট এখন পুঁজিবাদের কাঠামোগত সঙ্কটে পরিণত। আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দক্ষিণপন্থী নব্য ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিচ্ছে। কিন্তু ইতিবাচক দিকটি হলো এই যে, চারটি সামাজিক দ্বন্দ্ব এখনও বহাল আছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং বামপন্থী আন্দোলন ক্রমশ সংগঠিত হচ্ছে।

জাতীয় পরিস্থিতিতে সেই সময়ে নব্য উদারনীতির আক্রমণ ছিল না। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে এ দেশে চালু নব্য উদারনীতি ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, দারিদ্র, কর্মচ্যুতির পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব, সংসদীয় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পররাষ্ট্রনীতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

নব্য উদারনীতির প্রভাব মধ্যবিত্তদের উপর পড়ছে। বর্তমানে মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে একটি উচ্চমধ্যবিত্ত স্তর সৃষ্টি হয়েছে। কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত এরা নব্য উদারনীতির সমর্থক। এরা চায় আরও উন্নত জীবন এবং চাহিদাই এদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এতদসত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর ন্যায় মধ্যবিত্ত সমাজও বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। নব্য উদারনীতির দ্বারা তারা নানানভাবে আক্রান্ত। এ কারণেই ১৯৯১ সালের পরসংগঠিত ১৭টি সর্বভারতীয় ধর্মঘটে মধ্যবিত্ত সমাজ বিপুলভাবে অংশ নিয়েছে। মধ্যবিত্তদের গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ আছে। এখান থেকে তারা সকলের জন্য সমানাধিকারের দাবী তোলে। এরা চায় রাজনীতিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও অপরাধ মুক্ত করতে। অথচ এদের বাজার অর্থনীতিতে মোহ আছে এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রত্যাশা আছে। এদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী প্রবণতা আছে যা বিভিন্ন সময়ে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করে।

নব্য উদারনীতির ফলে বামপন্থীদের অবস্থান ও তাদের সাথে মধ্যবিত্তদের সম্পর্ককে দুর্বল করেছে। পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের মধ্যবিত্ত সমাজ প্রধানত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক-বীমার কর্মচারী, শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক, সরকারী পরিবহন, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বামপন্থী পরিবেশে। ফলে এদের সংগঠন, আন্দোলন, ঐক্য, চেতনার উপর স্বাধীনতাউত্তর কালের গণআন্দোলন, বিশেষত উদ্বাস্তু আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কিন্তু বর্তমানে এই চিরাচরিত মধ্যবিত্তর সংখ্যা কমছে। এতে যুক্ত হচ্ছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্টের লোকজন, তথ্যপ্রযুক্তির কর্মচারী, টেলিফোন বুথের লোকজন। এই অংশটি বিশ্বায়নের আবহাওয়ায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বাস্তবতা হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে।

বর্তমানে রাজ্য পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে কর্মচারী বিরোধী। ত্রিমুখী আক্রমণ এখানে কেন্দ্রীভূত। জীবন জীবিকা, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আক্রান্ত। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক অধিগারগত দাবীগুলি অমীমাংসিত। ১৯৬৮ সালের তৎকালীন সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপর ধর্মঘট চাপিয়ে দিয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার একইভাবে কর্মচারী সমাজকে ধর্মঘটের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কর্মচারী সংগঠনকে করণীয় নির্দিষ্ট করতে হবে।

(৬) করণীয় ঃ (ক) ১৬ মে ধর্মঘট ও তার পবরর্তীকালে অনুষ্ঠিত আন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে যে সাহসিকতা, আত্মত্যাগ ও উন্নত চেতনার পরিচয় তৎকালীন নেতৃত্ব-কর্মী-সংগঠকরা প্রদর্শন করেছে, সেই অমূল্য শিক্ষাকে পাথেয় করে অগ্রসর হতে হবে।

(খ) এই ধরনের অন্দোলন সবসময় তাৎক্ষণিক ফলাফল না দিলেও তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল যে ইতিবাচক হয় তার শিক্ষা কর্মচারী সমাজের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। উদাহরণ ঃ ১৯৬৬-এর গণছুটি, ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার, ১৯৬৮'র ১৬ মে ধর্মঘট, ১৯৬৯-র দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট, ১৯৭০-৭৭-এর আন্দোলন, ১৯৭৭ সালে প্রথম বাম সরকার।

(গ) সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে।

(ঘ) আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেসব নতুন কর্মী এসেছে, তাদের চিহ্নিত করে পরিচর্যা করতে হবে এবং গণসংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব যুক্ত করতে হবে। সংগঠনের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত চর্চা বাড়াতে হবে। বিভিন্ন সমিতির শতবর্ষ, সবুর্ণ জয়ন্তী বর্ষ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলিকে এই লক্ষ্যে ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) সংগঠনকে আন্দোলনমুখী এবং শেষপর্যন্ত ধর্মঘটমুখী করতে সাহসী, আত্মত্যাগসম্পন্ন এবং উন্নত চেতনা সম্পন্ন কর্মচারী সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

(চ) সংগঠনের সর্বস্তরের কর্মী-সংগঠককে ভালো মানুষ হতে হবে। ভালো মানুষ না হলে ভালো সংগঠক হওয়া যায় না। ৬৬-এর গণছুটি বা ৬৮-এর ধর্মঘটের নেতৃত্ব-সংগঠকরা ভালো মানুষ ছিলেন।

আগামী দিনের সংগঠন, আন্দোলন, ঐক্য, চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ১৬ মে-র ধর্মঘটের শিক্ষাকে পাথেয় করতে হবে। □

মুখ্যসন্ত্রী সমীপে খোলা চিঠি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আধা-খেঁচড়া ঘোষণা করে কিভাবে কমিটমেন্ট 'ফুলফিলড্' হল তা আমাদের বোধগম্য নয়। উদাহরণ হিসেবে মহার্ঘভাতার কথাই ধরা যাক। বকেয়া ছিল ৪৯ % শতাংশ। দেওয়া হবে ১৮%। বকেয়া থেকে গেল ৩১%। আবার আজ থেকে প্রায় ৭ মাস পরে ঐ ১৮% হাতে পাওয়া যাবে। এই সাত মাসের মধ্যে দু'দফায় (জুলাই '১৮, জানুয়ারি '১৯) কেন্দ্রীয় সরকার মহার্ঘভাতা ঘোষণা করবে। বর্তমান মূল্য সূচকের ভিত্তিতে বলা যায়, তার যা পরিমাণ দাঁড়াবে, তাকে অসংশোধিত বেতনক্রমে হিসেব করলে দেখা যাবে, পুনরায় বকেয়ার পরিমাণ আজকের জায়গাতেই পৌঁছে গেছে, বা ছাপিয়ে গেছে। আপনার কমিটমেন্ট কি এটাই, যেভাবেই হোক মহার্ঘভাতা বকেয়ার পরিমাণ ৫০ শতাংশের আশেপাশে রাখতেই হবে। তার থেকে কোনোভাবেই কম করা যাবে না!? নাকি ঘুর পথে মহার্ঘভাতার পরিমাণকে ১২৫ শতাংশে পেঁছে দিয়ে আপনি দায় সেরে ফেলতে চাইছেন? যেহেতু ১২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান করেই কেন্দ্রীয় সরকার বেতন সংশোধনের কাজে হাত দিয়েছিল, বিভিন্ন রাজ্য সরকারও তাই অনুসরণ করেছে, তাই আপনিও কি ১২৫ শতাংশ দিয়ে বোঝাতে চাইছেন সব দিয়ে দিলাম?? কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্যগুলিতো মহার্ঘভাতা ১২৫-এ পৌঁছনো মাত্র বেতন সংশোধনের কাজ সেরে ফেলেছিল। আপনার রাজ্যে তো তার কোন নামগন্ধ নেই। মানে দাঁড়াল বেতন কমিশনও পিছেলো, আবার মহার্ঘভাতাও ১২৫-এ বেঁধে দিয়ে বলা হবে—''আর চাইবেন না সব দিয়ে দিয়েছি। কমিটমেন্ট ফুলফিল করেছি!'' আপনার সরকারের অর্থমন্ত্রীতো ১০০ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়ার পরেই, বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন কোন মহার্ঘভাতা বকেয়া নেই! এমন কি বোঝা যায় আদালতেও হলফনামা দাখিল করে এমন কথাই আপনার সরকার বলেছিল। কোন বস্তু বা বিষয়ের ১০০ শতাংশ মানে সম্পূর্ণ অংশ। তাই ১০০ শতাংশ মহার্ঘভাতা মানে সম্পূর্ণ মহার্ঘভাতা--- এমনই ছেলে ভোলানো ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কি? কিন্তু বিজ্ঞাপনে দেখি আপনার জমানায় রাজস্ব সংগ্রহ ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে ২০০, ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে কর্মচারীদের মহার্ঘভাতাকে ১০০ বা ১২৫-এ বেঁধে রাখা কেন? জবাব দেবেন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী?

খোলা চিঠি লেখার সুযোগ নিয়ে আরও তিনটে প্রশ্ন করে লেখা শেষ করব। (১) আপনি কি ভুলে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে আপনার দলের নির্বাচনী ইশতেহারে কর্মচারীদের কাছে আপনার কি 'কমিটমেন্ট' ছিল? (২) বেতন কমিশন কি আদৌ দিনের আলো দেখবে? নাকি আপনার সরকারের হাতে পড়ে ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের যে দশা হয়েছিল তাই হবে? এবং (৩) আমরা সরকারী কর্মচারীরা যখন মোদীজীর সরকারের নীতির বিরুদ্ধে অন্যান্য অংশের খেটে খাওয়া মানুষের সাথে মিলে ধর্মঘট করি, তখন আপনার কেন 'গোঁসা' হয়?

আমরা জানি বিভিন্ন কারণে মোদীজীর বিরুদ্ধে মৌখিক আস্ফালন ছাড়া খুব বেশি দূরে আপনার পক্ষে এগোনো সম্ভব নয়। কিন্তু যারা সত্যিকারের লড়াইটা করতে চান তাঁদের শায়েস্তা করতে আপনার সরকারের এত তৎপরতা কেন? সবশেষে যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে বলি, আপনি অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তাই আপনার অজানা নয়, গণতন্ত্রের কোনো এক সন্ধিক্ষণে 'কিস্তিমাত' করে কিন্তু জনগণই।

ধন্যবাদান্তে
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

মুখ্যমন্ত্রী সমীপে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

পত্র নং-কো-অর্ডি-৩৪/১৮ তারিখ- ১৭ মে, ২০১৮
কলকাতা,

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় ঃ বর্তমান বছরে কর্মচারীদের ঈদ উৎসব ও শারদোৎসবের পূর্বে অ্যাডহক বোনাস, অগ্রিম ও অবসরপ্রাপ্তদের অনুদান প্রদান সম্পর্কিত

মহাশয়া,

আপনি ইতিমধ্যে অবহিত আছেন যে, সরকারীভাবে স্বীকৃত ও কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার হিসাবে ৮.৩৩ শতাংশ অ্যাডহক বোনাস তথা এক মাসের বেতন প্রতি বছর কর্মচারীদের প্রাপ্য।

যদিও গত বছ কর্মচারীদের নির্দিষ্ট ২৬,০০০ টাকা বেতন পর্যন্ত ঊর্ধসীমার ভিত্তিতে অ্যাডহক বোনাস হিসাবে ৩৬০০ টাকা ও ৩৬০০০ টাকা বেতন পর্যন্ত উর্ধ্বসীমার ভিত্তিতে কর্মচারীদের ৫০০০ টাকা হারে অগ্রিম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য ২৫০০০ টাকা পর্যন্ত অনুদান (এসগ্রাসিয়া) হিসাবে ১৯০০ টাকা প্রদান করা হয়েছিল। এছাড়া চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের ৩৬০০ টাকা অ্যাডহক বোনাস দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে কর্মচারী সমাদের এক সুবৃহৎ অংশ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

কিছুদিন হলো ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রমজান মাসের উপবাস শুরু হয়ে গিয়েছে ও আগামী ১৬ জুন, ২০১৮ ঈদ উল ফিতর উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সেই জন্য আসন্ন ঈদ উল ফিতর ও আগামী শারদোৎসবের পূর্বে সমস্ত স্তরের কর্মচারীদে জন্য অ্যাডহক বোনাস, অগ্রিম ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য অনুদান যথাযথ প্রাপ্য প্রদানের জন্য একান্ত অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদসহ,

ভবদীয়,
বিজয় শংকর সিংহ
(সাধারণ সম্পাদক)

স্মারক সংখ্যা-কো-অর্ডি-৩৯/১৮ তারিখ- ২২ মে, ২০১৮

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ

মহাশয়া,

আপনার স্মরণে আছে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জরুরী আর্থিক ও অধিকারগত দাবি নিয়ে একাধিক বার আপনাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মচারী সমাজের স্বার্থরক্ষায় পত্র দেওয়া হয়েছে। বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা, ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত প্রকাশ ও কার্যকরী করা, শূন্যপদ পূরণ, চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের সম কাজে সমবেতন, প্রশাসনিক জটিলতায় হেলথ স্কীমে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিলের অর্থ পেতে অযথা বিলম্ব হওয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি পূরণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেওয়া জন্য পুনরায় আপনার হস্তক্ষেপ অনুরোধ করছি।

ইতিমধ্যেই পেট্রোপণ্যের ব্যাপকভাবে দরবৃদ্ধি ও আকাশ ছোঁয়া চরম মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রশাসনে কর্মরত কর্মচারী, শিক্ষক মহাশয়গণ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জীবনধারণ যন্ত্রনাক্লিষ্ট ও দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই প্রায় সব রাজ্য প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা প্রদান ও বেতন কমিশনের সুপারিশক্রমে বর্ধিত বেতন লাগু করেছে। স্বাভাবিকভাবে অন্য রাজ্যের সাথে বেতন বৈষম্যজনিত কারণে আপনার কর্মচারী সমাজ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও চরম বঞ্চনার শিকার হচ্ছে।

এমতাবস্থায় কর্মচারী সমাজে জ্বলন্ত সমস্যা-- বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে প্রদান, ষষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত প্রকাশ ও চালু করা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ন্যায্য দাবিসমূহ দ্রুত ও সুষ্ঠু মীমাংসার দাবি জানাচ্ছি। আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ দাবিগুলির দ্রুত ও সুষ্ঠু মীমাংসার স্বার্থে আপনার সাথে আলোচনায় বসে কর্মচারী সমাজের আশু সমস্যাগুলি নিয়ে সমাধানের আশা করছি। আপনার বহুমুখীন ব্যস্ততার মধ্যেও আজকের এই পত্রসহ অতীতে বহুবার সাক্ষাৎকার চেয়ে চিঠি দেওয়ার আবেদনে সাড়া দিয়ে উল্লিখিত সমস্যাগুলি সমাধানে দ্রুত আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়,
বিজয় শংকর সিংহ
(সাধারণ সম্পাদক)

ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের আশু ও জ্বলন্ত কতকগুলি দাবি নিয়ে অধীক্ষকের নিকট ৫ ও ৬ জুন ২০১৮ ডেপুটেশন ও অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়। বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারীদের বকেয়া প্রমোশন প্রদান, সরকারী কাজ সরকারী প্রেসে করানোর ব্যবস্থা, সরকারী প্রেসগুলিকে আধুনিক করে গড়ে তোলার মূলত দাবি নিয়েই আলিপুর প্রেসের অধীক্ষকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৫ জুন ২০১৮, অধীক্ষকের ঘরের সামনে কর্মচারীদের নিয়ে বিক্ষোভ অবস্থান হয় ও ৬ ই জুন ২০১৮ অধীক্ষকের কাছে কর্মচারীদের নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশন কর্মসূচী ও বিক্ষোভ অবস্থানে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আলিপুর ইউনিট সম্পাদকমন্ডলীর নেতৃত্বে সাধারণ সম্পাদক অমিত ব্যানার্জ্জী, যুগ্ম সম্পাদক বাবলু ঘোষ ও রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটি কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের সম্পাদক সুব্রত গুহ উপস্থিত থেকে কর্মচারীদের সামনে বক্তব্য রেখেছেন। ৭ ই জুন ২০১৮ কাদাপাড়া ইউনিটেও ডেপুটেশন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। □

কোচবিহার ঃ গত ২৪ জুন ২০১৮ কোচবিহার জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে কর্মচারী ভবনে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক পুলক কান্তি বিশ্বাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি বাদল চতুর্বেদী। এই স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচীতে রক্তদাতা ছিলেন ৩ জন মহিলা সহ ৪০ জন। □

আলোচনা সভা

মালদা ঃ ৩রা জুন২০১৮ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মালদা জেলা শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো এক আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয় ছিল ''রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘটের ৫০ বছর পূর্তি''।

এদিন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘট যা ১৯৬৮ সালের ১৬ই মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে জেলায় এ ধরনের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক সুবীর রায়। এর পরে বিষয়বস্তুর ওপর কর্মচারী আন্দোলনের স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তরকালীন ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য তথা 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য।

১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রতন ভাস্কর সহ কো অর্ডিনেশন কমিটি, বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বগণ ও ব্যাপক অংশের কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন মলি দাস ও প্রদীপ রঞ্জন বোসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। □

বর্ধমান ঃ গত ২৬ মে, ২০১৮ জেলায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘটের ৫০ বছর উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মচারী ভবন, বর্ধমানে দুপুর ২টোয় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান জেলা শাখার সভাপতি সুকুমার পাল, জেলার পক্ষে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক করালী চ্যাটার্জ্জী। নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য গোপাল পাঠক। সভায় দেড় শতাধিক জেলার কর্মী নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ১৫জন মহিলা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।□

পুরুলিয়া ঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘটের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিগত ২ জুন, ২০১৮ পুরুলিয়া জেলায় একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কো অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি শ্যামসুন্দর বসু। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক লালমোহন গ্রহাচার্য। মূল বিষয়ের উপর আলোচনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার-এর সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা ১২ জুলাই কামিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক প্রচেতা দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এক শতাধিক কর্মচারী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভার শেষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগঠন তহবিলে ঐদিন পর্যন্ত জেলাগতভাবে সংগৃহীত ২০০০০ টাকা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মানস কুমার বড়ুয়ার হাতে তুলে দেন জেলা সম্পাদক লালমোহন গ্রহাচার্য। □

হুগলী ঃ গত ২০ মে ২০১৮ রবিবার, বিকেলে হুগলী জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে ধর্মঘটের ৫০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন, বলরাম বর্মন, মিনাক্ষী গুহ।

সভায় শোক পালন করা হয়। প্রারম্ভে জেলা সম্পাদক শম্ভু সেনগুপ্ত কর্মসূচীর প্রাসঙ্গিকতা এবং তহবিল সংগ্রহ সভায় মূল বক্তা ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

সভায় ১১৫ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ ছাড়াও কর্মরত কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। □

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘটের ৫০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে গত ০৩-০৬-২০১৮ তারিখ দুপুর ২.০০ টাকার সময় জেলা সংগঠন দপ্তরে আশীষ ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আলোচনা সভায় প্রায় ১২৫ জন কর্মচারী ও পেনশনার্স উপস্থিত ছিলেন। এই সভা পরিচালনা করেন রাম সিং, জেলা সংগঠনের সভাপতি ও অন্য দুই সহ সভাপতি রীতা ঘোষ ও অভিজিৎ সাঁতরাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভায় প্রাথমিকভাবে ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটসহ আগামী দিনের আশু কর্মসূচীগুলি আলোচনা করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক সন্তোষ দাস। আশীষ ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনায় ধর্মঘটের ইতিহাসসহ ১৯৬৮ সালের ১৬ মে-তে যে ধর্মঘট হয়েছিল তার আক্রমণাত্মক দিকগুলির সমূহ বিবরণ বর্ণনা করেন এবং বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলিসহ আমাদের করণীয় দিকগুলি তুলে ধরেন। সর্বোপরি বলা যায় আলোচনা সভা সফল হয়েছে। □

মহাকরণ ঃ প্রথম ধর্মঘটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহাকরণ অঞ্চলের উদ্যোগে বিগত ২৫ মে ২০১৮-তে ছুটির পর সিভিল ডিফেন্স বিল্ডিং-এ একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক পাত্র। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৬৫ জন কর্মচারী। □

পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ৭ জুন কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে 'কমরেড সুকোমল সেন স্মারক বক্তৃতা'-র আয়োজন করা হয়। সমিতির মুখপত্র 'শরিক'-এর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচীতে আলোচক ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুস্নাত দাশ। 'মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের প্রভাব ও আমাদের করণীয়' বিষয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন সভায় দেড় শতাধিক কর্মচারীবন্ধুর উপস্থিতিতে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিখিল পাত্র। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল নন্-মেডিক্যাল টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৪র্থ বর্ষ কমরেড সত্য ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা গত ২৩ জুন ২০১৮ সংগঠন দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আক্রান্ত গণতন্ত্র- প্রতিরোধের পর্ব''। আলোচনা করেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের সর্ব ভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক দেবজ্যোতি দাস। কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি মানস কুমার বড়ুয়া সভায় বিভিন্ন সংগ্রামী সংগঠনের নেতৃত্ব সহ প্রায় ৭০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বর্ধমান ঃ গত ১৬ মার্চ, ২০১৮ বর্ধমান জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় ''শোষণমুক্তির স্বপ্ন চোখে অর্ধেক আকাশ ঝড় তুলুক'' এই বিষয়ে জেলা থেকে তিনজন আলোচনা করেন। ছায়া মণ্ডল, মধুমিতা চ্যাটার্জী ও সুস্মিতা বুট জেলার আলোচক ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে আলোচনা করেন সূতপা হাজরা। বেলা ২.০০ টায় সভা শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রীনা কোনার। সভায় ৫১ জন মহিলা সহ মোট ১০১ জন উপস্থিত ছিলেন। □

রক্তদান কর্মসূচী

মহাকরণ ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মহাকরণ অঞ্চলের উদ্যোগে গত ২১ জুন ২০১৮ কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। কয়েক বছর নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে বন্ধ থাকার পর গত বছর থেকে পুনরায় এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন মহাকরণ অঞ্চল সম্পাদক সন্দীপ দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহাকরণ অঞ্চল সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শেখর রায়। রক্তদান শিবিরে ৩ জন মহিলাসহ মোট ৪৩ জন কর্মচারী রক্তদান করেন। □

লবণহ্রদ ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি লবণহ্রদ অঞ্চলের উদ্যোগে গত ২২ জুন ২০১৮ নির্মাণ ভবনে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীটির উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং সংগ্রামী হাতিয়ারের সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কল্যাণ রক্ষিত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি দীপক চক্রবর্তী। ১জন মহিলাসহ ৩৩ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। □

দক্ষিণাঞ্চল ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কলকাতা দক্ষিণ অঞ্চলের স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী গত ২৯ মে ২০১৮ গোপালনগরের সার্ভে বিল্ডিং-এ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শুরুতেই সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বজিৎ সরকার, সমরেশ চ্যাটার্জী এবং সোমনাথ দাস। একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অমিতাভ মিত্র। সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের সভাপতি রাজেন সিং। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অঞ্চলের সম্পাদক সুব্রত কুমার গুহ। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী উদ্বোধনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলির রক্তের চাহিদা পূরণ এবং মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচানোর স্বার্থে এই তীব্র দাবদাহের মধ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মীরাই এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বলে জানান। তিনি বলেন একদিকে যখন বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা আদায়, ষষ্ঠ বেতন কমিশনকে অবিলম্বে কার্যকরী করা, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, চুক্তি প্রথায় নিয়েজিত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন প্রদান, শূন্যপদ পূরণ এবং সর্বোপরি রাজ্যের লুণ্ঠিত গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের দাবিতে যখন সংগঠন লড়াই করছে, তখন এরই পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই ধরনের কর্মসূচী আমরা পালন করি বলে তিনি জানান। এই কর্মসূচীতে ২ জন মহিলাসহ ৩৯ জন রক্তদান করেছেন। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
47th Year, 1st Issue, May '18

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

১৯৬৮-র ১৬ মে প্রথম ধর্মঘটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি

১৯৬৮ সালের ১৬ মে সংগঠিত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘটের তৎপর্য এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ঐ সংগ্রামের প্রাসঙ্গিকতা সহ সমগ্র বিষয়টি নিম্নলিখিত ছয়টি অংশে ব্যাখ্যা করা হবে।

(১) ভূমিকা, (২) মধ্যবিত্ত সমাজ ও কর্মচারীদের মানসিক গড়ন নির্মাণে সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি, (৩) ১৬ মে ধর্মঘটের আর্থ-রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও আন্দোলনগত প্রেক্ষাপট, (৪) ধর্মঘটের প্রস্তুতি, দাবিদাওয়ার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিক কিছু প্রসঙ্গ, (৫) বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৬ মে ধর্মঘটের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষা, (৬) করণীয়।

(১) ভূমিকা ঃ ইতোপূর্বে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ২০১৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর গণছুটির ৫০তম বর্ষ উদযাপন করা হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ন্যায় একটি সংগ্রামী সংগঠনের কাছে যে কোনো সংগ্রামের অর্ধশত বা শতবর্ষ উদযাপনের বিষয়টি কখনও আনুষ্ঠানিক হতে পারে না। এটিও সংগ্রামের একট অংশ। বিশেষত আগামী দিনে আরো বৃহত্তম সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রশ্নে তা প্রেরণার কাজ করে।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের বিকাশের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ উপাদান তেমনই একইভাবে বাহ্যিক উপাদানটিও গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মঘটের পঞ্চাশ বর্ষ আলোচনা করার প্রক্রিয়ায় এই বিষয়টিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

(২) মধ্যবিত্ত সমাজ ও কর্মচারীদের মানসিক গড়ন নির্মাণে সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি ঃ এই প্রশ্নে চারটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যা আলোচনার দাবী রাখে।

(ক) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় সমাজ সংস্কার ঃ একথা সর্বজনবিদিত যে ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এর নেতৃত্বে যারা ছিলেন অর্থাৎ রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত এরা সকলেই ছিলেন সরকারী কর্মচারী। এছাড়া এই আন্দোলনে বাংলার মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ ছিল বিপুল। মধ্যবিত্ত সমাজ হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব ছিল।

(খ) ইংরেজি শিক্ষানীতি ঃ বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ আমলের গোড়া থেকেই আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার বিদ্বৎ সমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ''শুরুতে ইংরেজ শাসকরা ইংরেজি না সংস্কৃত, পাশ্চাত্য না প্রাচ্য কোন শিক্ষায় উৎসাহ দেবেন ও পোষকতা করবেন, সে সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেনি।'' যাই হোক এই টানাপোড়েনের মধ্যে ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ' এবং ১৯২৪ সালে 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপিত হয়। কয়েকজন আধুনিক মনস্ক ইংরেজ ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজের উদ্যোগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আসলে প্রথম যুগের ইংরেজ শাসকরা পণ্ডিত, মুন্সী, মৌলবীদের সাহায্যে শাসনকার্য চালানোর পক্ষপাতী ছিল। অথচ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বাঙালী ধনী ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৮৩৪ সালে ইংরেজীর বাংলা অভিধানের (১৮৫৪) ভূমিকায় রামকমল সেন লেখেন ''১৭৭৪ সালে এখানে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকেই ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।''

১৮১৭ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল ইংরেজী ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তর উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এই পর্বে বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীর বিকাশ শুরু হয় স্পষ্টত দুটি আলাদা ধারায়। একটি ছিল দেশীয় ঐতিহ্যের ধারা, অপরটি ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা। এই পরিস্থিতিতে ১৮৩৫ সালে চালু হয় মেকলের শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৮৫২ সালে সরকারী কলেজ ও বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার ৭৪২ জন। ১৮৫২ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত মোট স্নাতকের সংখ্যা ছিল ১৭১২ জন এবং এম.এ পাশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২৩ জন। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে সরকারী চাকরিজীবীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মার্কসের ভাষায় 'কলকাতা ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতে দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা সরকারের পরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইওরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।

(গ) সংবাদপত্রের ভূমিকা ঃ সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ঐ সময় সংবাদপত্রের প্রভাবও পড়ে। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে 'দিকদর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সময়েই প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পণ'। রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ১৮২১ সালের নভেম্বর মাসে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষায় 'সংবাদ কৌমুদী' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৮২৮-১৮৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ১৬টি বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। সতীদাহ প্রথা নিয়ে বিতর্ক, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব প্রতিক্রিয়া, সরকারের রাজস্ব নীতি, অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রভৃতি বিষয় পত্রিকাগুলিতে জনমতের প্রভাব কী—তা আলোচনা হতো।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার প্রসার, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে চর্চা-গবেষণার জন্য বিদ্বৎ সমাজের প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ, সৃজনশীল সাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাংলার মধ্যবিত্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনে পুরোধা হয়েছে। এর সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে একে খাটো করে বা অতিরঞ্জিত করে দেখার বিষয় নয়।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঃ অধ্যাপক সুমিত সরকার তার 'পপুলার মুভমেন্টস এ্যান্ড মিডল ক্লাস লিডারশীপ ইন্ লেট কলোনিয়াল ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন ''ভারতীয় জীবনে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্তের চারটি অবদান হলো ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার, দেশপ্রেমিক সাহিত্য, ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের মধ্য দিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি।''

এটা ঠিক যে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা সামাজিক সংস্কার আন্দোলন অনেকাংশে মধ্যযুগীয় ভাবধারা বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কাটাতে যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট থাকলেও ধর্ম ও জাতপাতের ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজকে তা ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। কারণ এদের মধ্যে অনেকেই ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের আশ্রয় নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে সেই সময়ের মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক চিন্তায় ও বাম জাতীয় আঞ্চলিক জাতপাতভিত্তিক সাম্প্রদায়িক চেতনা একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে। তৎকালীন সময়ে জাতীয়তাবোধ জাগাতে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে তিনটি ধারা (কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলন, সশস্ত্র সংগ্রাম, শ্রমিক কৃষক কর্মচারীদের সংগ্রাম) অবিভক্ত বাংলায় বেশ সক্রিয় ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মধ্যবিত্ত ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণ ছিল যথেষ্ট ভালো। স্বদেশী আন্দোলন থেকে কর্মচারী সমাজের বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে কুখ্যাত সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলস্ প্রণীত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই স্বাধানতী-উত্তরকালের গণআন্দোলনের পর্যালোচনা করতে হবে।

(৩) স্বাধীনতা-উত্তর কালের গণআন্দোলন ও ১৬ মে ধর্মঘটের আর্থ-রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও আন্দোলনগত প্রেক্ষাপট ঃ ২৬ মে ধর্মঘটসহ বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ। বিগত শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের অর্থনৈতিক মহামন্দা, তৎকালীন সময়ের শ্রমিক কর্মচারী কৃষকের লড়াই প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালের ডাক তার কর্মচারীদের আন্দোলন ও তার সমর্থনে ২৯ জুলাই বাংলার হরতাল প্রতিপালন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর যে সমস্ত ঘটনা কর্মচারী সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৪৮ সালে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন গঠন, ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গণ অবস্থান এবং সেখানে কমরেড জ্যোতি বসুর ভাষণ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সরকারী দমন পীড়নের মুখে দাঁড়িয়ে ফেডারেশনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায়নি। ১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ ৪৭৫ এফ সার্কুলারের মাধ্যমে সমিতি গঠন, আন্দোলন প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য আন্দোলনগুলি হল (১) পঞ্চাশ দশক জুড়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন; (২) ১৯৫৩ সালে ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে; (৩) ১৯৫৪ সালে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা সংযুক্তিকরণ বিরোধী আন্দোলন ও তার পরিণতিতে কলকাতার পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে বামপন্থী প্রার্থী মোহিত মৈত্রের জয়; (৪) ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট কলকাতার রাজপথে কৃষকদের খাদ্যের দাবীতে অভিযান ও পুলিশের লাঠিচার্জে ৮১ জন কৃষকের মৃত্যু; (৫) গোয়া মুক্তি আন্দোলন; (৬) বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার দাবীতে আন্দোলন; (৭) ইন্দো-চীনের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে প্রথমে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ও পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন; (৮) ১৯৫৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলন; (৯) ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ছয়দিন ব্যাপী আন্দোলন-ধর্মঘট; (১০) ১৯৬৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি খাদ্যের দাবীতে ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলি চালনায় বসিরহাটের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র নুরুল ইসলাম এবং কেরোসিনের দাবীতে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে কৃষ্ণনগর আনন্দ হাইতের মৃত্যু।

এই সময় আন্দোলন সংগ্রামগুলির পাশাপাশি মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের বিভিন্ন যৌথ সংগঠনগুলি আত্মপ্রকাশ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) ১৯৫১ সালে গঠিত হয় সারা ভারত বীমা কর্মচারী সমিতি এবং এদের প্রথম দাবী ছিল বীমা ব্যবসা জাতীয়করণ (২) ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্য দপ্তরে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত হয় যা পরবর্তীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের পটভূমি তৈরি করে।

১৯৫৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ২৫ টাকা বিশেষ ভাতা এবং কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবীতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের বাড়ির সামনে ২৫ হাজার কর্মচারীর দৃপ্ত জমায়েত হয়। এরপর দু'টাকা মহার্ঘভাতা মঞ্জুর হয়। মানি অর্ডার করে সরকারের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার আহ্বানে কর্মচারীদের বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। ১৯৬২ সালের ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর দেড় শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলন থেকে গঠিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।' এর সম্পাদক হন কমরেড অরবিন্দ ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক হন কমরেড শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য। পরবর্তী সম্মেলন হয় ১৯৬৪ সালে। এই সম্মেলন থেকে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি হয়।

এই সময়কার উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী হলো ১৯৬৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ৮ দফা দাবীতে সংগঠিত গণছুটির কর্মসূচী। এই কর্মসূচী বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং মহার্ঘভাতাসহ বেশ কিছু দাবী অর্জিত হয়। গণছুটির পূর্বে ব্লকস্তর পর্যন্ত বাড়িভাড়া ভাতা, কোয়াসী পার্মান্টে, পার্মান্টে স্ট্যাটাস, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগসুবিধা প্রদান প্রভৃতি অর্জিত হয়—যা পরবর্তী আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয়।

এই সময়ে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ১৯৬৬ সালের ১২ জুলাই শহীদ মিনারে জমায়েতের মাধ্যমে ১২ই জুলাই কমিটির আত্মপ্রকাশ। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন ১৯৬০ সালে গঠিত হয়।

(৪) ১৬ মে ধর্মঘটের প্রস্তুতি, দাবীদাওয়ার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিক কিছু প্রসঙ্গ ঃ ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মহার্ঘভাতা প্রদান, প্রথম বেতন কমিশন গঠন, বেতন কমিশনে শ্রমিক কর্মচারীদের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি সহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক অধিকারগত দাবী অর্জিত হতে থাকে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে রাজ্যের শ্রমিক কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। এর প্রতিফলন কর্মচারী আন্দোলনে পড়ে।

১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের চক্রান্তে এই রাজ্যে কংগ্রেস দলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো হয়। এরপর নেমে আসে ব্যাপক দমনপীড়ন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপক প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আক্রমণের শিকার হতে হয়। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে অর্জিত বিভিন্ন সুযোগসুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু কর্মচারী সমাজ এই আক্রমণ মেনে নিতে পারেনি। ১৯৬৬ সালের গণছুটির সাফল্য এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, কর্মচারী সমাজকে গণসংগ্রামের এবং সংগঠনের উপর ব্যাপক আস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। সুতরাং দমনপীড়নের বিরুদ্ধে এবং প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে অর্জিত সুযোগ সুবিধা রক্ষার দাবীতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নির্দিষ্ট দাবীসনদের ভিত্তিতে রাজ্যপালের সাথে ৩০ মার্চ, ৬৮ সংগটনের বৈঠক হয়। কিন্তু এই বৈঠক ব্যর্থ হয়। দাবীসনদের অন্তর্ভুক্ত দাবীগুলি ছিল বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ, তদ্‌সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান, ছাঁটাই ও অটোমেশন বন্ধ, বরখাস্ত কর্মীদের পুনর্বহাল, তহশীল কর্মচারী সহ ওয়ার্কচার্জড পীস রেট কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ ও তদ্‌সাপেক্ষে নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা প্রদান প্রভৃতি।

নির্দিষ্ট দাবীসনদের ভিত্তিতে রাজ্যপালের সাথে সংগঠনের আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় সংগ্রামকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে 'বিক্ষোভ সপ্তাহ' পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এই সপ্তাহের শেষে ২৭-২৮ এপ্রিল গণঅবস্থা-এর কর্মসূচী প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত হয়। এই সপ্তাহের শেষে ২৭-২৮ এপ্রিল গণঅবস্থানের কর্মসূচী প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত হয়। বিক্ষোভ সপ্তাহের কর্মসূচীতে কর্মচারীদের বিক্ষোভ ব্যাপক জঙ্গী চেহারা নেয়। এতে রাজ্যপাল, আমলাবাহিনী এবং গণছুটির প্রাক্কালে কংগ্রেস ভবনে জন্ম নেওয়া ফেডারেশনওয়ালারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জেলার কর্মচারীদের উপর আক্রমণ এবং হুমকি প্রদর্শন চলতে থাকে। কর্মচারী সমাজ কিন্তু দৃঢ় চেতনা নিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সরকার অবস্থান বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করে দেয়। এর ফলে কর্মচারীদের মনোবল আরও দৃঢ় হয়। অবস্থানের দিন ৫০ হাজার কর্মচারীর দৃপ্ত মিছিল যখন অবস্থান স্থলে প্রবেশ করে তখন লাঠি-বন্দু-কাঁদানে গ্যাস নিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী অবস্থানকারীদের রুখে দেয়। প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে কর্মচারীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। শেষপর্যন্ত কমরেড জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে এই বিশাল কর্মচারী সমাবেশ মিছিল করে শহীদ মিনারে জমায়েত হয়। এই জমায়েত থেকে ঘোষণা করা হয় ৮ দফা দাবিতে ১৬ মে'র ধর্মঘট।

রাজ্যব্যাপী এই ধর্মঘট বিপুল সাফল্য অর্জন করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মতে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ কর্মচারী এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। কংগ্রেসের মুখপত্র 'জনসেবক'-এর ভূমিকা ছিল ন্যক্কারজনক। ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দমনপীড়ন নেমে আসে। কলকাতায় ১০০ জন এবং

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

১৯৬৮ সালের ১৬ মে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রথম যৌথ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। এবছর ঐ ধর্মঘটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে ১৬ মে এক কেন্দ্রীয় আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি প্রকাশিত হলো।

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ **www.statecoord.org**
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক
১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।